মাৎভেই তেভেলেভ
স্নেগোভেৎসের
হোটেলে

সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণপশ্চিম অংশে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী আর রুমানিয়ার সীমান্তে আছে এক সবুজ পাহাড়শ্রেণী আর একটি সংকীর্ণ সমতল অঞ্চল। সেটাই হল সাব-কার্পেথিয়া, উক্রেনের তরুণতম প্রদেশ।

সাংবাদিক ও লেখক মাৎভেই তেভেলেভ সেখানে অনেক পথ হেঁটেছেন, দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন ভেরখভিনার পান্ডববর্জিত গ্রামগুলোয়—এ অঞ্চলের পাহাড়ে অংশটা ঐ নামেই অভিহিত।

তাঁর প্রথম বড়গোছের লেখা 'আমাদের আদরের দেশ ভেরখভিনা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। বইটিতে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে কার্পেথিয়ান জনগণের অতীত কাহিনী (পাঠকরা হয়তো তার ইংরেজী ফরাসী আর জার্মান অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত আছেন)।

'স্নেগোভেৎসের হোটেলের' গল্পগুলো উৎসৃষ্ট বর্তমান সাব-কার্পেথিয়ার প্রতি। উৎসৃষ্ট তার কাঠুরে, চাষী, ভেলাওয়ালা, খোদাইকার — তার সরল সহজ জনগণ, তাদের স্বপ্নচিন্তা আর কাজের প্রতি।

সোভিয়েত ছোটো গল্প গ্রন্থমালা

## মাৎভেই তেভেলেভ

# স্নেগোভেৎসের হোটেলে

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: শুভময় ও সুপ্রিয়া ঘোষ

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: আ. তারান

# সূচী


ভূমিকা হিসেবে . . . . . . . . . . . . . . ৫

অলৌকিক . . . . . . . . . . . . . . . ১০

মানুষের পরিচয় . . . . . . . . . . . . . ২৮

শ্বেত তিস্সা . . . . . . . . . . . . . . ৩৫

মণিকাঞ্চন . . . . . . . . . . . . . . . ৬৬

কর্তব্য ৮৯

ঝরণা . . . . . . . . . . . . . . . . . ১০৪

এতো সবে আরম্ভ . . . . . . . . . . . . . ১১২

পরিশেষ হিসেবে . . . . . . . . . . . . . ১৮৬
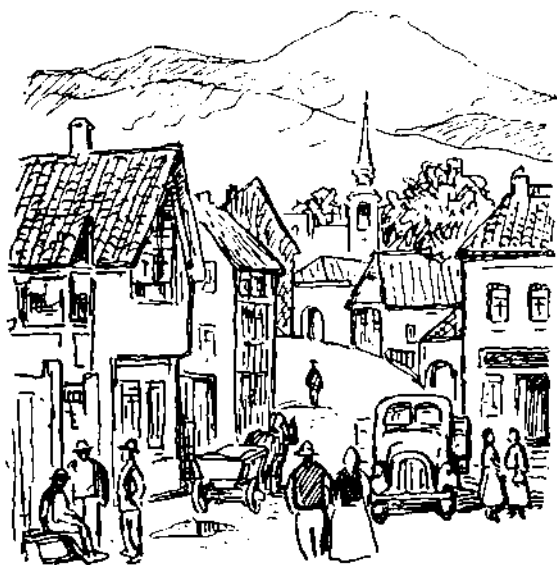
## ভূমিকা হিসেবে

পথ চলার সময় মানুষকে যেমন মন খুলে কথা বলায় পেয়ে বসে, এমন আর কখনও হয় না। যে কথা আমরা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকেও কখনো বলব না, সে কথা একেক সময় দেখেছি সহযাত্রীকে সহজেই বলে ফেলেছি। তার সঙ্গে এই প্রথম

দেখা, জীবনে আর হয়ত কোনদিন দেখা হবে না, তাই যে কথা বার কয়েক বলেও মনের ভার লাঘব করা যায়নি সে কথা বলার পক্ষে এই লোকটিই কি সবচেয়ে ভাল নয়? এই লোকটি ছাড়া আর কার কাছে প্রকাশ করব বহুদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অন্যের মুখে শোনা কাহিনী আর তেমন তেমন হলে কিছু অহঙ্কারও?

ভ্রমণ মানে শুধু চলাই নয়। হয়ত বদলীর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি কিম্বা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি যদি কেউ গাড়িতে উঠিয়ে নেয়, নয়ত রাত কাটাচ্ছি রাস্তার ধারের কোন হোটেল বা সরাইখানায় — এ সবই পড়ে 'ভ্রমণের' মধ্যে।

আমাদের কার্পেথিয়ান পাহাড়ে দেশে স্লেগোভেৎস নামে একটা জায়গা আছে। জেলা সদর, গিরিদ্বার থেকে বেশি দূরে নয়। স্লেগোভেৎসকে এখন আর গ্রাম বলা যায় না, আবার পুরোদস্তুর সহরও হয়ে ওঠেনি। একটা ছোট্ট খেয়ালী নদী ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ জুড়ে রয়েছে সে। জলের যখন প্রয়োজন নেই, তখন নদীর বদান্যতা দেখে কে, কিন্তু স্থানীয় বিদ্যুতাগার যখন জল জল করে মাথা খুঁড়ে মরে, নদী তখন অত্যন্ত কৃপণ। চারিদিকে অপূর্ব সুন্দর সব বড় বড় পাহাড়। পাহাড়গুলো প্রায় ঘরের দোরগোড়া থেকেই একেবারে সোজা খাড়া আকাশে উঠে গেছে, গায়ে তাদের কালো পাইন আর ফার বনের জোব্বা। মাঝে মাঝে বন কেটে তৈরী করা

উজ্জ্বল চৌকোণ শস্যের ক্ষেত আর উপরে লোভনীয় পাহাড়ে মাঠ।

চারদিকের রাস্তা এসে স্নেগোভেৎসে মিশেছে। ব্রিজের ধারে রাস্তার মোড়ে পনের মিনিট দাঁড়ালেই একটা না একটা গাড়ি জুটে যাবে। হয় মোটা চেনের ঝন ঝন শব্দ মুখরিত কাঠবওয়া লরী কিম্বা যৌথখামারের ঘোড়ার গাড়ি, নয়ত সমবায় দোকানের লরী, তাতে আবার গ্রামের দোকানের মালপত্রের নিজস্ব সেই গন্ধ — কেরসিন কফি জামাকাপড় আর মান্ধাতার আমলের মিষ্টি বিস্কুটের।

রাত্তিরের দিকে গাড়ি চলাচল কমে আসে — অন্ধকারে পাহাড়ের খাড়া পথগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্নেগোভেৎসে পৌঁছতে যে মোটরগাড়ি আর লরীগুলোর রাত হয়ে যায় তারা পথের ধারেই দাঁড় করান হয়। ছোট্ট হোটেলের সব খাট তখন ভরে যায়।

সব ছোট সহরের মতো স্নেগোভেৎসের অধিবাসীরাও নিজেদের সহর নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত, অতিরঞ্জনের দুর্বলতা তাদেরও আছে: ওরা বলবে, 'আমাদের এই পার্কটা', অথচ চোখের সামনে দেখতে পাবেন ছোট ছোট গাছ লাগান একটা চৌকো জমি মাত্র; 'এই আমাদের স্টেডিয়াম', তার মানে পায়ে মাড়ান গরু-চরা মাঠ; 'আমাদের সংস্কৃতি ভবন', সেটা একটা সাধারণ ক্লাব ছাড়া আর কিছুই নয়,—পুরোনো একটা

গ্দোম ঘরকে বদলে, অনাবশ্যক খরচপত্র না করে করা হয়েছে। কিন্তু স্নেগোভেৎস'এর সবচেয়ে বড় ভক্তও তাদের হোটেলটিকে হোটেল বলতে সাহস পায় না। রিসেপসন ক্লার্ক'এর জানলা, দ্'পাশে ঘরওয়ালা লম্বা করিডর, হলঘর, তার দেওয়ালে শিল্পী শিশ্কিনের স্বিখ্যাত 'পাইন বনে সকাল'এর একটি কপি থাকাই চাই—এ সব হতে আর বেশি দেরী নেই: সহরের মাঝখানে রাজমিস্ত্রীরা এর মধ্যেই নতুন হোটেলবাড়ির ছাদ বানাতে স্র্ করে দিয়েছে।

কিন্তু আপাতত... একটা নড়বড়ে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে আপনাকে উঠে যেতে হবে দোতলার একটা লম্বা ঘরে। সেখানে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি সার করে ফেলা রয়েছে সর্ সর্ লোহার খাট। ঘরের কোণায় এক বালতি ঠান্ডা জল আর একটা টুলের উপর ম্খ ধোবার গামলা আর মগ। ঘরে প্লাস্টার আর সদ্য ধোয়ামোছা মেঝের গন্ধ।

এই হোটেলেই আমি বছরের নানা সময় বহ্দিন কাটিয়ে গেছি।

স্নেগোভেৎসের চেনা লোকদের কাছে আমি একটা অদ্ভুত কিছ্।

'এত অস্বিধে করে আপনার এখানে থাকার দরকার কী?' তারা আমায় বলেছে। 'কারো বাড়িতে একটা আলাদা ঘর ভাড়া নিলেই তো পারেন। এখানে এমন হৈহল্লা যেন চত্বরে রয়েছেন।'

আমি কিন্তু সেই হোটেলের মাটি কামড়েই পড়ে থেকেছি। তার জন্য আমার কোন অনুশোচনাও নেই। হোটেলের শত অসুবিধের কথা কবে ভুলে গিয়েছি, কিন্তু ভুলতে পারিনি সেখানকার লোকদের কথা আর তাদের কাছে শোনা বহু গল্প। দীর্ঘ দুর্গম পথের সঙ্গীর মতো এরা আমার প্রিয়, আমার নিত্য সহচর।

## অলৌকিক

ভোরবেলার একটি ক্ষণস্থায়ী, অপরূপ মুহূর্ত আছে, আমি তার নাম দিয়েছি পূর্বাভাসের সময়। তা বেশিক্ষণ থাকে না, সংসারের তাড়াহুড়োয় আর সাধারণ পরিবেশে প্রায়ই আমাদের অলক্ষ্যে মিলিয়ে যায়।

স্নেগোভেৎসের কাঠের কলের বাঁশির আওয়াজটা বাচ্চা মোরগের তীক্ষ্ণ ডাকের মতো সারা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ার পরই আসে এই মুহূর্তটি।

বাঁশির আওয়াজ মিলিয়ে গেলে পর নেমে আসে পাতলা সুতোর মতো পলকা নিস্তব্ধতা।

যেদিন ভাল থাকে সেদিন ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে আমি চলে আসি সারা দোতলা জোড়া ঝুল বারান্দাটায়। ঘুম ক্লান্তি আলস্য কিছুই আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। বারান্দা থেকে দেখতে পাই পাহাড়ের পাড় ঘেরা স্নেগোভেৎসের সমস্তটা।

সূর্য ওঠেনি। কিন্তু তার ম্লান সোনালী আভা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ঢাল জুড়ে বনের কালো প্রাচীর, রাত্রির শেষ ছায়াটুকু সেখানে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে মরছে। সরু রাস্তাগুলোয় জনমানুষ নেই। বাড়িগুলো যেন ঘুমন্ত। পাহাড়ী ঠান্ডায় তাদের যেন শীত শীত করছে, ঘুমের মধ্যে পায়ের লেপ সরে গেলে লোকের যেমন হয়—ঠান্ডা লাগছে, কিন্তু কেন লাগছে তা বোঝা যায় না।

কিন্তু না, কেউই ঘুমিয়ে নেই। সবাই জেগে উঠে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অপেক্ষা করছে অপূর্ব অলৌকিক কিছুর। দিন আসছে! এ যেন যৌবনের কাল, তার সামনে পড়ে রয়েছে ভবিষ্যৎ জীবন।

প্রত্যেক সজীব প্রাণে অলৌকিকের বীজ অংকুর মেলেছে, ফুটে ওঠার জন্য তা প্রস্তুত। শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন সবকিছুকেই সে আনন্দে ভরে দিতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে: দিন শেষ হয়ে যায়—মনে হয়, যা কিছু করা উচিত ছিল সবই তো করেছি। কিন্তু অত্যাশ্চর্য অলৌকিকের দেখা মেলে না, নিজের মধ্যে কখন যে সে শুকিয়ে ঝরে যায় জানতেও পারি না। কেবল এইটুকুই বুঝতে পারি যে সে ফুটে ওঠেনি, আনন্দ আনেনি...

এই ব্যর্থতার বোধ অবশ্য একদিনের ব্যাপারই নয়। কখনও কখনও একটি দিন, কখনও বা কয়েক বছরের। তফাৎ এই যে অর্থহীন অপচয়ে নষ্ট জীবনের তিক্ততার চেয়ে একটি ব্যর্থ দিন নিয়ে অনুশোচনা মানুষের পক্ষে সহজ।

এই অলৌকিক কোথায় বাধা পেল, কী ত্রুটি ঘটল, একথা প্রায়ই ভেবেছি, কিন্তু উত্তর মেলেনি।

একদিন সকালবেলা হোটেলের আরও দু'জন অতিথি আমার সঙ্গে স্লেগোভেৎসের ভোর হওয়া দেখতে এলেন। তার আগের দিনই কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির অধিবেশন শেষ হয়েছে, আমার সঙ্গী দু'জন তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের একজন হলেন ডাক্তার নিকলাই গেরাসিমভিচ আভদেয়েভ। মোটাসোটা লোকটি, মাথার পাকা চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। বছর বার আগে আভদেয়েভ এই পাহাড়ের বুকে যুদ্ধরত গেরিলা দলের সঙ্গে ঘুরেছেন; তিনি ছিলেন সে দলের

চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, চিকিৎসা বাহিনীর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আভদেয়েভ জানালেন, তিনি কার্পেথিয়ান অঞ্চলেই কাজ করতে চান। উজ্‌গরদে তাঁকে যে কোন একটা হাসপাতাল বেছে নিতে বলা হল। দেয়ালের ম্যাপের কাছে এগিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভেরখভিনার* পাণ্ডববর্জিত একটা অজপাড়াগাঁ।

'ওখানে তো কোন হাসপাতাল নেই,' বেশ ভদ্রভাবেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল।

'তৈরী করব!' আভদেয়েভ বললেন।

'কিন্তু পরিকল্পনায় তো সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই,' জানান হল।

'লোকের মাপে জামা, জামার মাপে লোক নয়,' আভদেয়েভ বিড়বিড় করে বললেন।

কিয়েভ আর মস্কোয় ঘোরাঘুরি করে, দু'মাস ধরে কর্তৃপক্ষকে জ্বালিয়ে আভদেয়েভ তো শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের ব্যবস্থা করলেন। তারপর নিজের তৈরী সেই গ্রামের হাসপাতালে ডাক্তার নিযুক্ত হলেন।

যুদ্ধে ডাক্তার তাঁর পরিবারের সবাইকে হারিয়েছেন। একার সংসার, কিন্তু সর্বদা চেষ্টা করেন যতটা পারেন সকলের মধ্যে থাকতে।

সংসারে তাঁর আপনার বলতে ছিল কেবল একটা বেঁটে মোটা

---

* সাব-কার্পেথিয়ান পাহাড়ে অঞ্চল।

বুড়ো বাদামী রঙের যুদ্ধের ঘোড়া। নাম তার মিশকা। যুদ্ধের পর মিশকাকে সবাই খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল। কিন্তু ডাক্তার ঘোড়াটিকে উদ্ধার করে বহু সেবা যত্নের পর বাঁচিয়ে তোলেন। আজও ঘোড়াটা তাঁর একান্ত অনুগত।

সকালবেলা আস্তাবলের কাঠের খিলটা খুলে পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মিশকা যাবে পাহাড়ের উপরে ডাক্তারের ছোট্ট বাড়িটিতে, জানলার কাঁচে ঠোঁট ঘষে আভদেয়েভকে জাগাবে।

মিশকার পিঠে চড়ে এক পাশে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে ডাক্তার বেরবেন তাঁর সফরে। রোগী কখন তাঁর কাছে আসবে সে অপেক্ষায় তিনি থাকেন না। নিজেই রোগী খুঁজে বের করেন, অনবধানতার জন্য কষে ধমক দেন। ভাবখানা যেন আভদেয়েভ নিজেই অসুস্থ আর যাকে ধমকাচ্ছেন সে যেন তাঁর অসুখ সারাতে বাধা দিয়েছে।

এই ভোরবেলা আর একজন যে আমার সঙ্গে এসেছিল সে হল ফিওদর সুবতা, কাঠ খোদাইয়ের কাজ করে। এই জেলায়, হয়ত বা সারা ভেরখভিনাতেই সে বিখ্যাত।

উজগরদে যে জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হয়, সেখানে একাধিকবার তার হাতের কাজ তারিফ করেছি: কাজকরা কাঠের থালা, রাখালদের ছড়ি, মানুষের প্রতিকৃতি আর বাস-রিলিফের কাজ। ফিওদর সুবতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। জেলা পার্টি কমিটির অধিবেশনেই তাকে প্রথম দেখি। বলতে বাধা নেই, ভেবেছিলাম একজন বয়স্ক লোককে দেখতে পাব।

কিন্তু তার বদলে দেখতে পেলাম দীর্ঘকায় কালোচোখ বছর তেইশের একটি তরুণকে। সঙ্কোচহীন সহজ দৃষ্টি, চলাফেরায় হালকা দ্রুত চাল, দেখেই আঁচ করা যায় লোকটি আত্মনির্ভরশীল নিজের দোষগুণ সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

পাহাড় অঞ্চলের যন্ত্র ও পশুপ্রজনন কেন্দ্রে সে ছিল ট্র্যাকটর-টিমের ফোরম্যান। নিজের গাঁয়ের মাধ্যমিক স্কুল থেকে পাশ করে সুবতা এই কাজে ঢোকে। অন্যরা তাকে আরও পড়াশুনো করতে বলেছিল, উজগরদ বা কিয়েভের শিল্প-বিদ্যালয়ে ঢোকার পরামর্শ দিয়েছিল। সুবতা কিন্তু নিজে যা ভালো বোঝে তাই করে।

'আমি কিন্তু কী ঘটছে তা শোনার জন্য অপেক্ষা করে রইলুম...' সুবতা আমায় পরে বলেছিল!

'কোথায় কী ঘটছে?'

'আমার নিজের মধ্যে।'

ট্র্যাকটরড্রাইভারের কাজটা সুবতার ভালই লেগেছে। তরুণ মনের সরল স্নেহ নিয়ে সুবতা যন্ত্রটির দেখা শোনা করে। তার কাঠ খোদাই'এর কাজেও ব্যাঘাত ঘটেনি, হাতে সময় পেলেই সে কাঠ খোদাইয়ে বসে যায়। ছেলেবেলা থেকে এই তার নেশা।

সুবতা যেখানেই যায় সঙ্গে থাকে তার কাঠ খোদাই'এর যন্ত্রপাতি। পকেটগুলো সারাক্ষণ ছোট বড়ো কাঠের টুকরোয় ভর্তি। সবকিছু একেবারে হাতের গোড়ায় তৈরী। সময় পেলেই সে খোদাইয়ে লেগে যাবে।

বয়স অল্প হলেও পরিবারটি তার বিরাট। শোনা যায় সে প্রেম করে বিয়ে করেছে দ্বটি সন্তানের মা এক বিধবাকে। বছর ঘ্বরতে না ঘ্বরতেই স্ববতাকে মহিলা আরেকটি ছেলে উপহার দিলেন। স্ত্রীর আদলে স্ববতা কাঠ দিয়ে তর্বণী মেয়ের ছবি খোদাই করেছে। মেয়েটি বারান্দার সিঁড়িতে বসে কোলের শিশ্বটিকে দ্বধ খাওয়াচ্ছে। তার স্বন্দর মিষ্টি হাসি ভরা ম্বখটি উপরে তোলা। তবে আকাশের দিকে নয়, একটি প্বর্বষের দিকে। প্বর্বষটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার উপস্থিতি অন্বভব করা যায়। ঝুঁকে পড়ে সে যেন স্ত্রীকে আদর করে এমন কিছ্ব একটা স্নেহের বলছে, যা দ্ব' জনের পক্ষেই প্রয়োজনীয়।

কেন্দ্রের পরিচালক স্ববতার কাছ থেকে ম্বর্তিটি চেয়ে নিয়ে ক্লাবে রাখেনি, রেখেছে অফিসে যেখানে ট্র্যাকটরড্রাইভাররা প্রতিদিনের কাজ ব্বঝে নেয়। ছ'মাস ধরে সেটি ওখানেই রয়েছে। অফিসঘরে যারাই আসে তাদের মনেই এই খোদাইয়ের কাজটি স্বন্দর ছাপ ফেলে, দপ্তরের ব্বড়ো কেরাণী একথা আমাকে জোর দিয়ে বলেছে। 'মেয়েটির সামনে কোন খারাপ কথা বলতে, এমনকি মেঝেতে সিগারেটের টুকরো ফেলতেও সবাই লজ্জা বোধ করে। তাছাড়া মনের মধ্যে কেমন একটা খ্বশীর ভাব সঞ্চারিত হয়। বাঁধাধরা দস্তুরীর ভার লাঘব হয়,' ব্বড়োর কথা এটা।

যা হোক ফিওদর সুবতা আর ডাঃ আভদেয়েভ তো আমার সঙ্গে এসে সেদিন ভোরবেলা বারান্দায় দাঁড়ালেন।

কলের বাঁশির শব্দের পর যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, তা একটি সুরেলা আওয়াজে আবার ভেঙে গেল। মনে হল কে যেন একটা বিরাট পুরোন তালায় চাবি ঘোরাচ্ছে। তারপর হঠাৎ কিসের গুঞ্জন আর গোঙানি সুরু হল, ঠিক যেন লাট্টু ঘুরছে — অদূরে পার্টির জেলা কমিটির ড্রাইভার সেক্রেটারীর গাড়ির ইঞ্জিন চালাতে সুরু করেছে। রাস্তার নুড়িগুলো আওয়াজ করে উঠল: কাঠের কলের মজুরেরা দলে দলে সাইকেল চড়ে চলেছে, কেরিয়ারে তাদের খাবার ঝুলি আর থারমোফ্লাস্ক বাঁধা। ভেসে এল সদ্য সেঁকা রুটির গন্ধ আর মেয়েদের গলার স্বর। হাড়জিরজিরে লোকটা সোডার জলে ভরা নীল সাইফনওয়ালা ঠেলা গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, স্নেগোভেৎসের দপ্তরে দপ্তরে প্রতিদিন ঘুরে বেড়ানই তার কাজ। কাঠবোঝাই এক সার লরী ঘরঘর আওয়াজ তুলে পার হয়ে গেল সাময়িক ভাবে গড়ে তোলা কাঠের ব্রিজটা, তারা চলেছে গিরিদ্বারের মুখে।

'দিন সুরু হল!' সুবতা বলল। 'কিন্তু এদিন আমাদের জন্যে কী বয়ে আনছে?' তাকে চিন্তান্বিত দেখাল।

'আমরা তাকে যা দেব,' নিজের হাতের তেলোটা নিরীক্ষণ করতে করতে উত্তর দিলেন ডাক্তার।

'ঠিক বলেছেন,' সুবতা মেনে নিল, 'যেরকম বীজ পুঁতবে

সেরকম ফসলই পাবে... কভালেৎসের কথাটা কিন্তু মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না ...'

'ঠিক,' ডাক্তার বললেন, 'খুব ধাঁধা লাগানো ব্যাপার।'

আলোচনাটা আবার সেই পুরোন বিষয়ে ফিরে এল। সারা রাত আমরা এই নিয়েই কথা বলেছি।

ভাসিলি কভালেৎস পাহাড় অঞ্চলের একটি বড় যৌথখামারের পার্টি সেক্রেটারী। গত অধিবেশনে তার রিপোর্ট ছিল অন্যতম আলোচনার বিষয়। কভালেৎসের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও বহুদিনের। জেলা পার্টি কমিটিতে ও কাজ করার সময় থেকেই আমার সঙ্গে ওর আলাপ। তারপরে আঞ্চলিক পার্টি ইস্কুলেও কভালেৎস পড়েছে। কভালেৎস মাঝ বয়সী লোক, শক্তসমর্থ, বুদ্ধিমান। উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব নেই। তাড়াতাড়ি যে কোনো কাজ শেখার ঈর্ষাজনক গুণটিও তার আছে। তার ফলে কভালেৎসকে থেকে থেকেই এক কাজ থেকে আরেক কাজে পাঠান হয়। জেলা কমিটির কে যেন তার নাম দিয়েছে "দমকল"। নামটা মোটেই বেমানান নয়। কোথাও কোন কাজের গোলমাল হলেই, টানা হেঁচড়ার দরকার হলেই পাঠান হয় কভালেৎসকে। আর কভালেৎস গেলেই সব ঠিক হয়ে যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য জেলা পার্টি কমিটির কাছে কভালেৎসের নামে অভিযোগ এসেছে, কভালেৎস বড় রুক্ষ, অন্যর মতামতের সে যথোচিত দাম দেয় না।

তবে কমিটির সবাই বলে, 'মানুষ তো আর দেবদূত নয়। রুক্ষ বা বদমেজাজী হলেও কাজ কেমন করে সেটা তো দেখতে হবে।'

একবছর আগে কভালেৎস একটা বড় যৌথখামারের পার্টি সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়। যৌথখামারের কাজ মোটেই ভাল চলছিল না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই খামারের উন্নতি দেখা গেল। তখন আবার কভালেৎসকে অন্য গোলমালের জায়গায় পাঠাবার গুজব শোনা যেতে লাগল। কিন্তু তা আর ঘটল না। স্নেগোভেৎস জেলা পার্টি কমিটির আগেকার সেক্রেটারী রুসিঙ্কো কিয়েভে তিন বছরের পাঠক্রম শেষ করে ফিরে আসার পর তাকেই আবার প্রথম সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। কভালেৎসের হয়ে সেই কথা বলল:

'কমরেডরা, কভালেৎসের কথাটা একবার বিবেচনা করে দেখ। ওকে বহুবার একাজ থেকে ওকাজে ঘোরান হয়েছে, এবার ওকে একটা সুযোগ দাও। খামারের কাজ যখন ভাল চলছে, তখন ঐ কাজ নিয়েই ওকে থাকতে দাও।'

তারপর যা ঘটল তা ব্যাখ্যার অতীত। কভালেৎস সেই খামারে তো আগেকার মতো বা আরো বেশি উৎসাহে ও উদ্যমে কাজ করতে লাগল, কিন্তু একবার সব ঠিক হয়ে যাবার পর খামারের কাজ আবার গেল অবনতির দিকে। পার্টির সেক্রেটারী আর ইন্‌স্ট্রাক্টররা তো এল কভালেৎসের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না,

কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই, কভালেৎসের সব পরিকল্পনা কাঁটায় কাঁটায় চলে। তার নিখুঁত কাজ অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। এমনকি পার্টি কমিটির অধিবেশনেও শক্তসমর্থ কভালেৎসের রিপোর্টের কোন ভুল ধরা গেল না, তদন্তকারীরা তার প্রতিটি কথা সমর্থন করল। রিপোর্ট সংক্রান্ত শেষ প্রস্তাবে 'যথেষ্ট নয়' কথাটা বারবার ব্যবহৃত হল বটে, কিন্তু গন্ডগোলের মূল কারণ যে তা নয়, তা সবাই বুঝল, কভালেৎসও। আসল জরুরী ব্যাপারটা যে ধরা গেল না সেটা বুঝতে কারো বাকি রইল না।

পার্টির অধিবেশন শেষ হয়ে গেছে। তারপর আরেকটি নতুন দিন এসেছে। আমরা কিন্তু এখনও কভালেৎসের কথাই আলোচনা করে চলেছি।

'এখন তবে ওর কী কর্তব্য?' বিশেষভাবে কাউকে জিজ্ঞেস না করেই আভদেয়েভ বললেন, 'এ সমস্যার সমাধানটা কী?'

'হয়ত ওর কিছু করাই উচিত নয়,' বলল সুবতা।

'না, না,' আভদেয়েভ আপত্তি জানালেন, 'কভালেৎসের কাজের ক্ষমতা তো আর কেড়ে নিতে পারি না। আগে যে সে এত সফল হয়েছে সেকি এমনি এমনি?'

'আগে সে সফল হয়েছে সেকথা ঠিক,' সুবতা মেনে নিল, 'কী করে হয়েছে তাও বোধ হয় জানি। সবাইকে ধমকে, ভয় দেখিয়ে, টেবিল চাপড়ে। অল্প কিছুদিন এতে কাজ হতে পারে, কিন্তু বেশিদিন নয়।'

'না, না,' আভদেয়েভ আবার বললেন। কিন্তু এবার তাঁর প্রত্যয় যেন কিছু কমে এসেছে, চশমার উপর দিয়ে সুবতার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে আমার দিকে তাঁর ঢুলুঢুলু চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'কাল রাত্রে আপনি অলৌকিক কিছুর আশা করছিলেন। অলৌকিক হল প্রতিভা, তাই না?'

'নিশ্চয়ই,' আমি সায় দিয়ে বললাম।

'আর প্রতিভা জিনিসটা কী? শুধু কি সক্ষমতা? ছন্দ মেলাতে বা ছবি আঁকতে ওস্তাদ এমন অনেককেই আমি জানি, তারা তাদের কবিতা ছাপিয়েছে, ছবিও প্রদর্শনীতে দিয়েছে, কিন্তু তবুও তাদের কবি বা শিল্পী বলা যায় না। কাজেই সক্ষমতা ছাড়াও আরো কিছুর প্রয়োজন আছে...'

'কাজের প্রতি ভালবাসা...' বলল সুবতা।

'নিশ্চয়ই,' ডাক্তার মাথা নেড়ে সায় দিলেন, 'কিন্তু সেভাবে বিচার করলে তো আমিও প্রতিভাবানদের দলে পড়ে যাব। আমি তো কিছুতেই আমার এ কাজ ছাড়ব না। কভালেংসেরও কাজের ক্ষমতা আর কাজের প্রতি ভালবাসা দুইই আছে...'

'ভালবাসারও রকমফের আছে ডাক্তারবাবু,' সুবতা বলল, 'যেমন বাবার ভালবাসা আর মামার ভালবাসা।' তারপর একটু থেমে সুবতা আবার বলল, 'কিন্তু অলৌকিকের আভাসটা সত্যি, অলৌকিক যে একটা ছোট্ট বীজ সেটাও সত্যি। সাধারণ বীজকে কী করে অঙ্কুরিত করতে হয় তা আমি জানি

কিন্তু এব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ...' সুব্রতা সানন্দে চারদিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল, 'মাথা ঘামাবার আমাদের এত বিষয় আছে যে কুলিয়ে উঠতে পারা কঠিন। দিনের কাজ সুরু করার সময় হয়েছে।'

ডাক্তার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে তাঁর কাজে গেলেন। আমি বসে গেলাম আমার খবরের কাগজের লেখা নিয়ে। সুব্রতার পরদিনই যন্ত্র ও পশুপ্রজনন কেন্দ্রে তার বাড়িতে যাবার কথা। সে বেরিয়ে গেল তার বন্ধুদের জন্য জিনিস কিনতে। দুপুরবেলা তার সঙ্গে আবার দোকানে দেখা। হাতে একটা বিরাট ফর্দ নিয়ে সে রকমারি কেনাকাটায় ব্যস্ত: দুটো টুপি, একটা কাপড়কাচার পাটা, কিছু দাড়ি কামাবার ব্লেড, একটা কিমা করার যন্ত্র, বাচ্চার স্নানের টব একটা আর কতগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড। আমি তার অলক্ষ্যে তার পাশে কয়েকমিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। কেনাকাটায় তার সত্যিকার আনন্দ দেখে বেশ লাগল। জিনিসগুলো যে সে তার অসংখ্য আত্মীয়দের জন্যই কিনছে সেকথা সুব্রতা দোকানদারকে ভাল করেই বুঝিয়ে ছাড়ল।

আবার অনেক রাত্রে সবাই হোটেলে জমায়েত হলাম। সুব্রতাকে ভোরবেলা রওনা হতে হবে, তাই সে সবার আগে শুতে গেল। হোটেলের অন্য অতিথিরাও তার অনুসরণ করল। আমি রোজকার মতো রেডিয়োর শেষ খবরের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ডাক্তার আভদেয়েভও আমার সঙ্গে রয়ে গেলেন।

দোকানের সামনেই লম্বা খ‍ুঁটিতে একটা লাউড স্পীকার লাগান ছিল, বারান্দায় বসে বসেই খবর শ‍ুনতাম।

খবর শেষ হয়ে গেলে পর প্রচারক পরের দিনের আবহাওয়ার খবর পড়তে লাগল; ঠিক সেই সময় কে যেন এসে বেঞ্চিতে আমাদের পাশে বসল। বেশ অন্ধকার। তাই প্রথমটা স‍ুবতাকে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। পায়ে জ‍ুতো নেই, খালি গায়ের উপর একটা জ্যাকেট চড়ান।

'শ‍ুন‍ুন,' স‍ুবতা ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগল, 'ব্যাপারটা এবার মাল‍ুম হয়েছে।'

'কী মাল‍ুম হয়েছে?'

'সব কিছ‍ু!' স‍ুবতা জবাব দিল। 'ইভান পালিৎসা নামে একজন লোক ছিল, তার কথা আপনাদের বলি শ‍ুন‍ুন। দ‍ু' শ' বছর আগে খ‍ুস্‌ত সহরে ছিল তার বাস। আসলে অবশ্য সে আমাদের অঞ্চলেরই লোক। সে সময় উজ, তিস্‌সা আর লাতোরিৎসায় ব্যারণ আর কাউণ্টদের নিজস্ব দ‍ুর্গ ছিল। পালিৎসার তখন অল্প বয়স। এক ছ‍ুতোরের কাছে সে কাজ শেখে।

'একবার বসন্ত কালে তিসসায় ভীষণ মড়ক লাগল। ঘাস কাটিয়ের মতো মড়ক তিসসার লোকদের ধরাশায়ী করতে লাগল। লোকজনরা রোগ এড়াবার জন্য যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। কিন্তু যেখানেই যায় তাদের পথ জ‍ুড়ে দাঁড়ায় সশস্ত্র বাহিনী। জমিদাররা নিজের নিজের জমিদারীতে গিয়ে আশ্রয়

নিল। বুড়ো কাউণ্ট, — তিনি ঐ অঞ্চলেই থাকতেন, — স্বভাবটা রুক্ষ হলেও পণ্ডিত লোক, দুর্গের ভিতর একবার যে ঢুকলেন আর দরজা খুললেন না। তিনি নিজের জন্য যত ভীত তার চেয়ে বেশি ভীত তরুণী স্ত্রীটিকে নিয়ে। সাধারণ ঘর থেকে তাকে এনেছেন, কিন্তু হলে কি হবে, এ অঞ্চলে তার মতো সুন্দরী আর নেই।

'এখন এই মেয়েটির সঙ্গেই দেখা হল পালিৎসার। দুর্গের ভিতর নয় রাস্তায়। মুমূর্ষু লোকদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান মেয়েটির কাজ। বেড়ায় সে একাই। কোন প্রার্থনা নয়, কোন দুঃখ প্রকাশ নয়, যেমন করে পারে সাহায্য করে, দুটো আনন্দের কথা বলে, মৃত্যুকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের ধমকধামক দিয়ে প্রত্যেকের মনে সে আশার সঞ্চার করে চলে। মেয়েটি যেখানেই যায় সেখানেই যেন পাথরের দেয়াল গাঁথা হয়ে যায়, প্লেগের সাধ্যি কি সেই দেয়াল ঘাসের মতো কেটে নামায়?

'পালিৎসা এ সবই দেখল। মেয়েটিকে সে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে।

'বুড়ো কাউণ্ট তো এদিকে বউ পালিয়েছে জানতে পেরে, নিজেই তার পিছন পিছন ধাওয়া করলেন ... বউকে খুঁজে পেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তার কত সাধ্যসাধনা গায়ের জোরি ... মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই ফিরল না।

'এদিকে পালিৎসা ... পালিৎসা মেয়েটিকে আগেই দেখেছিল। কাউণ্টের দুর্গে সে যখন তার গুরুর সঙ্গে কাজ

করত তখনই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এতদিন তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এখন তার মনপ্রাণ ঐ মেয়েটিতে ভরে উঠেছে। মন থেকে মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেবার মতো শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই।

'মড়ক তো কমে এল। কিন্তু যাবার সময় বুড়ো কাউণ্টের বউকে নিয়ে গেল।

'সবাই ভাবল বুড়ো বুঝি দুঃখে মারাই যায়। কিন্তু সময়ে সব দুঃখই সয়ে যায়।

'কাউণ্ট তখন মুকাচেভো আর খুস্‌তে যত সেরা স্যাকরা আছে সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তারা আসতে কাউণ্ট বললেন:

'"আমার যত সোনাদানা আছে সব নিয়ে গিয়ে আমার বউয়ের মূর্তি তৈরী করে আন। তোমরা তাকে জানতে, তাই তার কথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। তার চেয়ে দুর্মূল্যরত্ন আমার আর কিছুই ছিল না। তার প্রতিমা গড়া যায় কেবল সোনা দিয়েই।"

'স্যাকরারা তো যে যার বাড়ি ফিরে কাজে বসে গেল। মাস দুয়েক পর আবার তারা দুর্গে ফিরে এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে সোনার মূর্তি। সবাই গুণী শিল্পী, তাই প্রত্যেকের কাজই অত্যন্ত সুন্দর। প্রত্যেকেই গড়েছে মেয়েটির মৃত্যুর প্রতিকৃতি। চোখদুটি বোজা। কী অপূর্ব সব মূর্তি! বুড়ো কাউণ্ট কিছুতেই আর মনস্থির

করতে পারেন না কোনটা নেবেন। হঠাৎ কাউণ্টের নজরে পড়ল একজন অচেনা লোক, হাতে তার রুমালে জড়ান কী একটা। স্যাকরারা সবাই কাউণ্টের পরিচিত, কিন্তু এ লোকটিকে কাউণ্ট কখনো দেখেননি।

'"তুমি কে?" কাউণ্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'"ইভান পালিৎসা। খুস্তের এক ছুতোরের কাছে কাজ শিখি।"

'"তা, তুমি এখানে কেন?"

'"আমিও এনেছি ..."

'রুমালটা সরিয়ে দিতেই সবার চোখে পড়ল কাঠের উপর খোদাই করা একটি তরুণীর মুখ। লোকে বলে, চুল তার বাতাসে আন্দোলিত, ঠোঁটদুটিতে মমতার অস্ফুট ভাষা, খোলা চোখদুটিতে আশার দীপ্তি। তার অলৌকিক শক্তি এত প্রবল যে স্যাকরারা সব পিছিয়ে গেল আর বুড়ো কাউণ্ট রেগে উঠে চেঁচিয়ে বললেন:

'"তুমি ওকে ভালবাসতে! নিশ্চয়ই ভালবাসতে!.."'

নিজের মনে কী ভাবতে ভাবতে সুবতা কথাটা বার কয়েক আউড়ে চলল।

আমরা চুপ। শুধু ডাক্তার আভদেয়েভের দীর্ঘ 'হ্যাঁ-া-া' শব্দটি সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল।

'এই তো সব প্রশ্নের উত্তর,' ডাক্তার বললেন, 'এর স্পর্শে কাঠও সোনার চেয়ে দামী হয়ে ওঠে, কারিগরী পরিণত

হয় শিল্পে আর অলৌকিকের ছোট্ট বীজটি নিজেই হয়ে ওঠে অলৌকিক। কভালেংসের বিষয়ে এই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটাই আমাদের চোখে পড়েনি... অথচ সেটাই সবচেয়ে জরুরী!..'

তারায় ভরা আকাশ। ঝিরঝিরে উষ্ণ বাতাস। পাহাড়গুলো যেন বেঁটে হয়ে গেছে। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তিতে তারা যেন স্লেগোভেৎসের চারধারে বসে পড়েছে, রাখালরা যেমন মাঠের বুকে আগুনের চারপাশে বসে থাকে। সূর্যের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে নতুন দিনকে স্বাগত জানাবার জন্য তারা প্রস্তুত।

## মানুষের পরিচয়

স্তুদেনিৎসায়, স্তুদেনিৎসা কেন, সারা স্নেগোভেৎস অঞ্চলেই ওলিওনা স্তেফাকের ছেলে আন্দ্রেইয়ের মতো সুপুরুষ ব্যক্তি আর পাওয়া যাবে না।

তার সবকিছুই সুন্দর — চলাফেরা, তামাটে মুখের কাট, ধূসর তীক্ষ্ণ চোখদুটি, বাঁ ভুরুর বাঁকা ভঙ্গিমা সবই। ভুরুর

ঐ বাঁকাভাবটির জন্য তার মুখে একটা বিস্ময় বা ঠাট্টার অভিব্যক্তি লেগে থাকে।

আন্দ্রেই স্তেফাক শুধু যে তার সৌন্দর্যের জন্যই খ্যাত তা নয়, তার মতো ফুলবাবুও আর কেউ নেই। পাহাড় অঞ্চলের কাঠের কলের ট্র্যাক্‌টরড্রাইভার সে, বয়স তার মাত্র উনিশ, কিন্তু সাজসজ্জা প্রসাধনের দিকে তার যা নজর, ভেরখোভিনার নাম করা সুন্দরীরাও হার মেনে যায়। সবুজ কানাৎ দেওয়া সাদা পশমের জ্যাকেট, পুঁতির নক্সাকরা সার্ট, ফারের গুচ্ছ লাগান টুপি আর কাঁটা লাগান উঁচু পাহাড়ে জুতো -- এই হল তার বেশবাস। হাঁটার ভঙ্গীটি বেশ হাল্‌কা, ধীরমন্থর। জামাকাপড় পরার কায়দায় একটা চেষ্টাকৃত অযত্নের ভাব।

ফিওদর স্ক্রিপ্‌কা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'আন্দ্রেই, ব্যাপারটা কী বল তো, কাজের দিনে এরকম ছুটির দিনের সাজ কেন?'

'কাজের দিন বলে আমার কাছে কিছুই নেই ভুইকু,* সবদিনই আমার ছুটির দিন', আন্দ্রেই বেশ গম্ভীরভাবে বলল।

আন্দ্রেই নাচে খুব কম সময়েই যোগ দিত, কিন্তু তবু সে কখনো কোনরকম পার্টি বা বিয়ের আসর বাদ দিত না।

---

* খুড়ো -- বয়সে যারা ছোট তারা বড়দের এই বলে ডাকে।

দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে ঘাসের শীষ চিবতে চিবতে সে যেন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নাচিয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকত।

মেয়েরা তো তার জন্য পাগল। কিন্তু আন্দ্রেই কাউকে বিয়ে করতে চাইলে বোধ হয় উত্তর দেবার আগে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ভাল করে ভেবে চিন্তে দেখে নিত। অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস চোখের জল ফেলেও শেষ পর্যন্ত কোন মেয়ে আন্দ্রেইকে বিয়ে করার ঝক্কি নিত না।

'ওকে বিয়ে করলে ভোগান্তির শেষ হবে না,' প্রবীণারা বলত, 'সুন্দর লোককে বিয়ে করার অসীম দুর্গতি, তার উপর ওর আবার কথাবার্তা চোখের চাউনিও মোটেই সুবিধার নয়...'

আন্দ্রেই স্তেফাক সম্বন্ধে শুধু মেয়েরাই যে একথা বলে তা নয়। এমন কি গরুলিয়া — না ভেবে চিন্তে ঝট করে কারো সম্বন্ধে মন্তব্য করা তার স্বভাব নয় — সে পর্যন্ত দুঃখ করে বলে, ওলিওনার ছেলেটার আছে কেবল চেহারা আর জাঁক। আর কিছুই না।

গরুলিয়া একদিন স্লেগোভেৎস থেকে স্তুদেনিৎসায় ফিরছে। খামারের পশুশালার জন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা লরী আসছিল। গরুলিয়া লরীতে উঠে পড়ল।

তখন মার্চের মাঝামাঝি, বরফ হঠাৎ গলতে সুরু করেছে। উপত্যকায় স্বল্প বৃষ্টি, ওদিকে পাহাড়ে দুদিন ধরে পাতলা বরফ মেশানো প্রবল ধারাপাত। চারদিক ঘোলাটে, ঝাপসা। ছোট ছোট পাহাড়ে নদীগুলো ফেঁপে ফুলে উঠেছে, পাৎলা

কাঠের সাঁকোগুলো জলের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। বেঞ্চির স্যাঁৎসেঁতে, এমনকি ড্রাইভারের কামরাতেও ভেজাভেজা লাগছে।

গরুলিয়া ড্রাইভারের পাশে বসে ঠাণ্ডায় কাঁপছে। বাতাসে ক্যানভাস হুডের কানাৎটা পৎপৎ করে নড়ছে। গরুলিয়া তারই আওয়াজ শুনে চলেছে। তারপর এমনই কপাল, হঠাৎ ইঞ্জিনটা গেল বিগড়ে। ড্রাইভার তো গালাগাল করতে করতে গাড়ি সারাতে লাগল। সারানো সাঙ্গ হল যখন তখন কুয়াশায় ঢাকা সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ভেজা বরফের ভারি পর্দা আর গোধূলির অন্ধকার ভেদ করতে পারে গাড়ির হেড্‌লাইটের সে ক্ষমতা নেই। স্তুদেনিৎসা তখনো বহুদূরে।

অবশেষে গাড়ি তো চলল। পথটা ক্রমশই পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। ইঞ্জিনটা গজরাতে গজরাতে গাড়ি প্রাণপণ চেষ্টায় উপরে উঠেছে। গিরিদ্বারের দিকে যতই এগোতে থাকে, ততই হাওয়ার জোর বেড়ে যায়, বরফ ঘন হয়ে পড়তে থাকে।

গরুলিয়া দেখে চলেছে ড্রাইভার কী চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে ঐ আঁকাবাঁকা পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে লরীটাকে নিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার কায়দা করে একেকটা বাঁক ফেরা মাত্রই গরুলিয়া বাহবা দিয়ে একটা শব্দ করে ওঠে। এই বয়সেও গরুলিয়া অন্যদের যে কোন কাজের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হতে সক্ষম, বিশেষ করে যে কাজ সে নিজে পারে না।

তারপর এল গিরিদ্বার। লরীটা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল। হেডলাইটের আলোটা যেন জলে গুলে গিয়ে তেলচিটচিটে হয়ে উঠেছে। খালি ডাইনে বাঁয়ে নড়ছে। হঠাৎ সেই আলোয় অন্ধকারের বুকে একটি মানুষের শরীর ফুটে উঠল। লোকটি লরীর দিকেই এগিয়ে আসছে। রাস্তা ছেড়ে একেবারে খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

'এরকম দিনে কে বেরুতে পারে?' গরুলিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ড্রাইভার ব্রেক চেপে ধরে গাড়ি থামিয়ে দরজাটা খুলল। ইঞ্জিনটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই গরুলিয়ার কানে এল গিরিদ্বারে হাওয়ার তুমুল গর্জন।

'শুনছেন,' গরুলিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'বেশি দূরে নয়,' শান্ত কণ্ঠে জবাব এল, 'বসতিতে যাব।'

'কিন্তু আপনি লোকটি কে?'

'আমায় চিনতে পারছেন না?'

লোকটি লরীর দিকে এগিয়ে এল। গরুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

'আরে, আন্দ্রেই যে!'

'হ্যাঁ, আমিই ভুইকু। আচ্ছা, আসি তাহলে!'

'এমন দিনে হঠাৎ বসতিতে চলেছ, ব্যাপার কী?'

'কিছুই নয়, একটু মজা করতে চলেছি।'

'মরগে, যাও!' গরুলিয়া জবলে উঠে থুক করে থুতু ফেলল। 'তোমার মতো হতভাগাকে আটকান দায়!'

আন্দ্রেই হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে যেন মনের অনেক বাধা কাটিয়ে উঠে আস্তে আস্তে বলল।

'তবে শুনুন ব্যাপারটা, স্তেপান ওস্ত্রোভ্‌কার ওখানে চলেছি।'

গরুলিয়ার কান খাড়া হয়ে উঠল। বুড়ো স্তেপানের মেয়েটি বছর খানেকের বেশি খুব ভুগছে। অনেক দিন উজগরদে হাসপাতালে ছিল, এখন তাকে কিয়েভে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপারেশন হবে। অপারেশনে বিশেষ কিছু ফল হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবু একবার শেষ চেষ্টা, যদি মেয়েটিকে বাঁচান যায়। রোগটা তার সাংঘাতিক।

'ওস্ত্রোভ্‌কার কাছে কেন?' গরুলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'এমনি,' আন্দ্রেই শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'গ্রাম সোভিয়েতে আমি থাকতে থাকতেই বুড়োর নামে একটা টেলিগ্রাম এল। সব ঠিক আছে, গাফিয়া একেবারে ভাল হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি? সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'তুমি বুঝি টেলিগ্রামটা নিয়ে চলেছো?'

'অফিসে টেলিগ্রামটা তো সেই সকাল পর্যন্ত পড়ে থাকবে?'

আন্দ্রেই বলল, 'বুড়োর তো এমনিতেই রাত কাটতে চায় না ... আচ্ছা, চলি তাহলে!'

জলে ভেজা টুপির কানাৎটা চোখের উপর টেনে দিয়ে আন্দ্রেই চলতে সুরু করল।

স্তুদোনিৎসার বাকি আট কিলোমিটার পথটায় গরুলিয়া আর ড্রাইভার একটিও কথা বলল না। ড্রাইভার থেকে থেকে খালি লরী থামিয়ে উইন্ড স্ক্রীনের বরফ মোছে। লরীটা গ্রামের পথ দিয়ে চলতে সুরু করার পর গরুলিয়া প্রথম কথা বলল।

'মিথাইলো!' ড্রাইভারের উদ্দেশে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল যেন সে অনেক দূরে রয়েছে।

'কী বলুন কমরেড সেক্রেটারী,' ড্রাইভার জবাব দিল।

'বলছিলাম কী,' গরুলিয়া চিন্তান্বিতভাবে বলল, 'অন্যের দুঃখ বা আনন্দের সময়েই মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয়ে কখনো ভুল হয় না!'
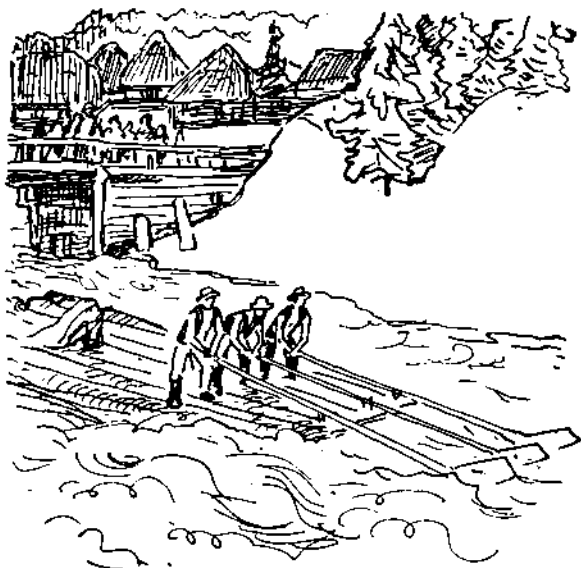
## শ্বেত তিস্‌সা

পনের বছর আগে শ্বেত তিসসা তার দুই ছেলে পিওতর আর সেমিওনকে টেনে নিয়েছে।

বসন্তের বন্যার সময় তারা ভেলিকয়ে বিচ্‌কভোর দিকে কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। পাথুরে চড়ার গায়ে পড়ে

হিমশীতল জলের তখন কী গর্জন আর ফেনা ছড়ান! সংকীর্ণ কার্পেথিয়ান উপত্যকা সে গর্জনে ভরে গেছে আর হুৎসুলের ভেলাওয়ালা জলের ঝাপটায় রামধনু রং তুলে তরতর করে ভেলা নিয়ে চলেছে — এত জোরে যে ঘোড়ায় চড়েও তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলে না।

দুপাশের গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা আর ঘরকুনো বুড়োরা ভেলা দেখতে নদীর পাড়ে ছুটে এসেছে।

'সা-মা-ল!' ভেলাওয়ালাদের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে বুড়োরা। তারা নিজেরাই একদিন শ্বেত তিস্‌সার বুকে ভেলায় কাঠ নিয়ে পাড়ি দিয়েছে।

'সা-মা-ল!' ছোট ছেলেরা বুড়োদের প্রতিধ্বনি তুলছে। তারাও একদিন ভেলা নিয়ে পাড়ি জমাবে।

ভিজে জুবজুবে ভেলার মাল্লারা কিন্তু আগে থেকেই সতর্ক হয়ে রয়েছে। পা ফাঁক করে সামনে একটু ঝুঁকে তারা দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাহাড়ের ঢালু বেয়ে স্কি-খেলুড়েরা নামছে। নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখ তাদের বেজায় টনটন করছে, ভেলার মাথায় বসান লম্বা লম্বা হালগুলো তারা শক্তহাতে ধরে রেখেছে।

ভেলাগুলো একটা আরেকটার পিছনে ভেসে চলেছে, মাঝখানে কেবল কয়েক মিনিটের ব্যবধান। নদীর বুকের উপর ঝোলা ছোট্ট সাঁকোগুলোর তল দিয়ে ভেলাগুলো সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাল্লারা তখন উবু হয়ে বসে পড়ছে, কাঠের

সাঁকো প্রায় তাদের মাথা ঘেঁষেই বেরিয়ে যাচ্ছে। সাঁকো পেরন মাত্র তাদের শরীরগুলো এক ঝটকায় আবার খাড়া হয়ে উঠছে।

পিওতর আর সেমিওনের ভেলার সঙ্গে আবার একটা ছোট্ট ভেলা লাগান ছিল। আসল ভেলাটা চব্বিশটা ফারগাছের গুঁড়ির তৈরী। তার পিছনে বাঁধা রয়েছে অন্যটা। সামনের ভেলাটার মাঝখানে দুটো গুঁড়ির মধ্যে একটা দুমুখো তক্তা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। তার উপর ঝুলছে সবুজ ফ্ল্যানেলের পাড় দেওয়া দুটো সাদা জ্যাকেট আর ক্যানভাসের একটা থলে, তাতে রয়েছে কিছু বেকন আর কর্ণরুটি।

ভেলা চলেছে পিওতর আর সেমিওনের গ্রাম পার হয়ে। ছোট ভাই সেমিওন, মুখে তার বসন্তের দাগ, বয়স নেহাৎ কম, হঠাৎ দেখতে পেল বাচ্চা কোলে একটি মেয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মেয়েটি ভেলা দেখাবার জন্য বাচ্চাটিকে দুহাতে তুলে ধরেছে। চোখে রোদ পড়ায় তার চোখ কুঁচকে গেছে।

'এই পিওতর!' সেমিওন তার ভাইকে ডেকে বলল, 'ঐ যে তোমার ওলিওনা য়ুরকোকে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে!'

'ওসব এখন দেখতে হবে না!' পিওতর ধমকে বলল, বউ আর দুবছরের ছেলেটাকে দেখার ইচ্ছে অবশ্য তারও ছিল। জলে রোদের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। জীর্ণ টুপির কানাৎটা পিওতর চোখের উপর আরো টেনে নামিয়ে দিল।

ঠিক পাঁচমিনিট পিছনেই আসছে ওদের বাবা, বুড়ো মিখাইলো বেলানিয়ুক তার ভেলা নিয়ে। এখনো সে খুব বুড়ো হয়ে পড়েনি, তবে তিস্‌সার যত ভেলার মাল্লাদের মধ্যে সেই সেরা। ছোট্টখাট্ট লোকটিকে তাই সবাই শ্রদ্ধা করে। পঞ্চান্ন বছর বয়স হলে কী হবে, তার মতো সাহসী আর দক্ষ মাল্লা আর নেই। নদী কোথায় হঠাৎ নিচে নেমেছে, কোথায় কোন পাথর আর চড়া লুকিয়ে আছে সব তার নখদর্পণে। এই ছোট্ট ভীষণ নদীর মনমেজাজ তার ভাল করেই জানা, যেন এক বাড়িতেই দুজনে থেকেছে। কখন তার সঙ্গে ছলচাতুরী করতে হবে, কখন কিছু গায়ের জোরি, তা সবই তার জানা। কোন জায়গায় বিশ্বাস করে স্রোতের মুখে ভেলা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, সে কথাও তার অজানা নয়। তিস্‌সাকে কি সে ভালবাসে? সে কথা নিয়ে বুড়ো বেলানিয়ুক কখনো মাথা ঘামায়নি। বউয়ের কাছ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নেয়, প্রেমিকার কাছ থেকে দয়িতকে, তীরের কবরখানাগুলোয় প্রতিবছর বাড়িয়ে চলে ক্রুশের সংখ্যা, এমন নদীকে কি ভালবাসা যায়। অবশ্য বেলানিয়ুকের পরিবারের প্রতি সে সদয়। বেলানিয়ুকের বাবা আর ঠাকুর্দা দুজনেই মারা গেছে স্বাভাবিকভাবে। আর মিখাইলোও তো দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটে ছেলেদের নিয়ে কাঠের গুঁড়ি ভাসিয়ে চলেছে। নদীর সত্যিকার পরিচয় মিখাইলো জানে। তাই তিস্‌সার সঙ্গে তার সম্পর্কটা অত্যন্ত সহজ সরল, নিছক কাজের সম্পর্ক।

ছেলেদের বেলায় মিখাইলো খুব কড়া। তাদের নিয়ে গর্বও খুব, যদিও মুখ ফুটে কাউকে সেকথা সে বলে না। ছেলেদুটি যেমনি সাহসী তেমনি খাটতে পারে। বউ যখন মারা গেল মিখাইলোর তখন কতই বা বয়স, কিন্তু তবু সে আর বিয়ে থাওয়া না করে নিজের হাতেই ছেলেদের মানুষ করেছে। গ্রীষ্মের উষ্ণ দিনে ছোট ছোট ছেলেদুটির হাত ধরে সে চলে যেত নদীর ধারে। ঢেউয়ে ধোয়া চ্যাপ্টা একটা পাথর খুঁজে নিয়ে তার উপর ছেলেদের দাঁড় করিয়ে দিত, তারপর কনকনে ঠাণ্ডা জলে তাদের স্নান করত।

অন্য কোন ভেলার মাল্লা এ কাজ করলে তাকে নিয়ে কম হাসিঠাট্টা হত না, মেয়েলি কাজের জন্য তার একটা নামও দেওয়া হত। কিন্তু শ্বেত তিস্সার রাজা স্বয়ং এ কাজ করলে সে কথা আলাদা — বনরক্ষকরা বেলানিয়ুককে ঐ নামেই ডাকে।

বড় ছেলে পিওতর যখন বিয়ে করে তার ঘর ছেড়ে কনের বাড়িতে গিয়ে উঠল, মিখাইলোর তখন খুব খারাপ লাগে। মনের ঈর্ষা সে মনেই চেপে রাখল, সুন্দরী হাসিখুসি পুত্রবধূটিকে সে মোটে দেখতে পারত না — ছেলেকে সে কেড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেই ঘৃণাও সে লুকিয়ে রাখল। নাতির মুখ দেখেও ওলিওনার প্রতি বুড়োর রাগ দূর হল না। পিওতরের বাড়ি মিখাইলো খুব কমই যায়, তাও যায় যখন নাতিকে আর কোন ভাবে দেখার উপায় থাকে না, তখনই। সে থাকে

সেমিওনের সঙ্গে। বুড়োর মনে ভীষণ ভয়, কোনদিন কোন সুন্দরী এসে তার ছোট ছেলেটিকেও না নিয়ে যায়।

তাও নিল, কিন্তু কোন সুন্দরী মেয়ে নয়, শ্বেত তিস্‌সা। তাও আবার একসঙ্গে দুছেলেকেই।

গ্রাম পেরিয়ে একটা জোরাল বাঁক ঘুরেই পিওতরদের ভেলা পড়ল গিয়ে একেবারে স্রোতের মাঝখানে। উপত্যকাটা এখানে বেশ চওড়া, অনেকটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের মুখ থেকে নদীটা তার উপর এসে পড়ছে প্রবল বেগে।

'ডাইনে সামলে। নইলে স্রোতে টেনে নেবে!' পিওতর ভাইয়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠে সারা শরীরের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল হালের উপর।

সেই স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার। দুহাতের মাংসপেশি যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। জল থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা আর বাতাস সত্ত্বেও ভীষণ গরম লাগছে, হাঁপ ধরে যাচ্ছে। শাদা ফেনা ওঠা ঢেউগুলো ভেলার দুধারে ভীষণ জোর বাড়ি মারছে। কাঠের গুঁড়িগুলো পায়ের তলে সশব্দে লাফিয়ে উঠছে, আড়কাঁড়িতে তারা যেন বাঁধা থাকতে চায় না। কিন্তু পিওতর আর সেমিওন, মাথা ঠাণ্ডা করে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ভেলাটাকে কিছুটা শান্ত জলের দিকে নিয়ে এল।

আর কয়েক মিটার মাত্র বাকি এমন সময় হঠাৎ এক তুমুল তোলপাড় শব্দ। জলের নিচে লুকনো তীক্ষ্ন পাথরে লেগে ভেলা হঠাৎ থেমে গেছে। পিওতর আর সেমিওন কিছু বোঝার

আগেই পিছনে বাঁধা ছোট ভেলাটা খাড়া হয়ে উঠে বাঁধন ছিঁড়ে সোজা একেবারে বড় ভেলাটার উপর এসে পড়ল। ভেজা কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে পিওতর আর সেমিওনের পিঠে লাগাল এক মারাত্মক ধাক্কা। পিওতর আর সেমিওন ছিটকে পড়ে গেল। ছোট ভেলাটাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে আবার জলের উপর পড়ল। ছেলেদুটির সার্ট মুহূর্তের জন্য বাতাসে চমকে উঠে সেই উজ্জ্বল উন্মত্ত জলের অতলে সব মিলিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই মিখাইলো বেলানিয়ুকের ভেলাটা গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল। বিপর্যয়ের চিহ্নগুলো বুড়োর চোখে পড়ল, তার সঙ্গীরও। একটা খোঁটামতো পাথরের চারপাশে একটা আধভাঙা ভেলা পাক খাচ্ছে, যেন ঐ পাথরটাতেই সেটাকে নোঙর করে রাখা হয়েছে। কয়েকটা ভেজা কাঠের গুঁড়ি খাড়া পাড়ের কাছে ভেসে গিয়ে ঝোপে আটকে একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভয়ে মিখাইলোর সারা শরীর অবশ হয়ে গেল।

'সাঙাত,' ওর গলা দিয়ে আওয়াজই বেরয় না প্রায়, 'আমার পিওতর আর সেমিওনের ভেলা।'

মিখাইলোর মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, তার সঙ্গী বলবে, 'না, না, ওদের ভেলা নয় মিখাইলো!' কিন্তু সঙ্গীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হালটা হাত থেকে প্রায় ফেলে দিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল:

‘ভগবান! পিওতর আর সেমিওন!’

তারপর আর বুড়ো বেলানিয়ুকের কিছুই মনে নেই। তার ভেলা তীরের দিকে এগিয়ে গেল, লোকজন সবাই নদীপারে ছুটে এল, কিছুই তার মনে নেই। মিখাইলো নদীর তীরে বসে রইল, হাতে কেন জানি না জলে ধোয়া রোদে গরম একটা নুড়ি। সবার কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তারা কী বলছে, কেন বলছে, কিছুই বুঝতে পারছে না।

পিওতর আর সেমিওনের মৃতদেহের সন্ধান সুরু হল। বেলানিয়ুককে সবাই বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইল, বুড়ো কিন্তু কিছুতেই যাবে না। সেও একটা লগি তুলে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে নদীর তীর ধরে এগিয়ে গেল।

চারদিন ধরে অনুসন্ধান চলল। রাখভো পর্যন্ত তারা গেল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। বুড়ো নিজে ধীরস্থিরভাবে অনুসন্ধানের পরিচালনা করে চলল, পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করল। তার সেই শান্তভাব সত্যিই ভয়াবহ। মনে হল পিওতর আর সেমিওনের খোঁজ করছে না, খোঁজ করছে দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের।

চারদিনের দিন সন্ধ্যার দিকে মিখাইলো আর তার বন্ধুরা বাড়ি ফিরল। চারদিনের মেহনতে তারা ভেঙে পড়েছে। একটা শুঁড়ীখানায় ঢুকে সবাই পিওতর আর সেমিওনের অমর আত্মার

উদ্দেশে পালিঙকা* খেতে লাগল। প্রচুর মদ টানল সবাই, প্রথমে নিঃশব্দে বিষণ্ণ মনে। তারপর সুরু হল নিজেদের দুঃখদারিদ্র্যে ভরা নিরানন্দ জীবন নিয়ে অভিযোগের পালা।

বৃষ্টি নামল। প্রায় অন্ধকার শুঁড়ীখানায় স্যাঁতসেঁতে ভাব। দেয়ালভরা মাছির দাগ, তামাকের ধোঁয়ায় কালো কতগুলো বিজ্ঞাপন টাঙান: ব্যবসায়ীরা বেচতে চায় তাদের মাল। জাহাজ কোম্পানিগুলো বলছে, পৃথিবীর যে কোন বন্দরে যেতে চান নিয়ে যাব।

'একটা গুপ্তধনটন পেয়ে গেলে বেশ হয়,' হঠাৎ গভীর হতাশার সঙ্গে বলল বুড়ো মিখাইলো, একটু নেশা তার ধরেছে, 'তারপর সবকিছুকে, সারা জগৎকে কলা দেখিয়ে বেড়াব!'

'গুপ্তধন — ঠিক বলেছ,' সায় দিল মিকলা সুবতা, বেলানিয়ুকের জোড় সে। মোটাসোটা স্বপ্নালু লোকটির উপর বিরাট পরিবারের ভার। 'গুপ্তধন পেলে পর সারাদিন শুঁড়ীখানায় বসে বসে জানলা দিয়ে নদীতে থুক্ করে থুতু ফেলব। ব্যস্!'

'না, না, মিকলা। নদী সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলা উচিত নয়', ঘরের কোণ থেকে কে যেন ধমক দিয়ে বলে উঠল। 'নদীই তো বাপু, তোমার আমার মিখাইলোর মুখের অন্ন জোগাচ্ছে ...'

'মোটেই না!' বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে মিখাইলো চেঁচিয়ে

---

* একধরনের ঘরে তৈরী কড়া মদ।

বলল, 'আমার এই হাতদুটোই আমার মুখের অন্ন জোগায়, এই হাতদুটো ...' মিখাইলো নিজের হাতদুটো প্রচন্ড জোরে টানতে সুরু করল, জঞ্জাল দুটোকে যেন ছিঁড়ে ফেলতে চায়, সেগুলো যেন এখন বোঝার মতো।

সবাই ধরে বেঁধে মিখাইলোকে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিয়ে আরেক গ্লাস পালিঙ্কা এনে দিল। গ্লাসটা শেষ করে মিখাইলো কিছুটা শান্ত হল।

'কিন্তু গুপ্তধনটা কোথায় পাওয়া যায়?' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিকলা জিজ্ঞেস করল।

'বনের মধ্যে,' মিখাইলো বলল, 'দভবুশের* লোকেরা এখানেই তাদের ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছে।'

'কিন্তু তুমি আমি কি পাব?'

মিখাইলো কোন উত্তর দিল না।

লোকে বলে আরো কিছুদিন পরে বেলানিয়ুকের যখন দুঃখটা সয়ে গেল তখন সে মিকলা সুবতাকে নিয়ে বনে গিয়েছিল গুপ্তধনের সন্ধানে, কিন্তু কিছুই জোটেনি।

বুড়ো বেলানিয়ুক এখন বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছে, পাহাড়ের গায়ের ছোট্ট কুঁড়েঘরটায় বসে বসে পরপারের দিন গুনছে।

ওদিকে মিখাইলোর ছেলের বৌ ওলিওনা বিধবা হবার দু'এক বছর পরেই বনের এক রেঞ্জারবাবুর নজরে পড়ে গেল।

---

* জাতীয় বীর নায়ক।

সে এসে ওলিওনা আর তার ছেলে বাচ্চা য়ুরকোকে নিয়ে চলে গেল ত্রিশ কিলোমিটার দূরে তার বনের বাড়িতে। বুড়ো মিখাইলো মাঝে মাঝে নাতিকে দেখতে যেত। কিন্তু ইদানীং তাও আর পারে না, শরীর বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। পথও তো অনেকটা। মিখাইলো এখন আর শ্বেত তিস্‌সার বুকে কাঠের গুঁড়ি ভাসায় না। সপ্তাহে দুদিন যখন উজান থেকে ভেলাগুলো গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যায় মিখাইলো দরজায় খিল এঁটে বসে থাকে, একমাত্র জানলাটায় ছাগলের চামড়ার কোট ঝুলিয়ে দেয়।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নিঃসঙ্গতা তার আর সহ্য হল না। নদী লোকজন, কুড়ুলের আওয়াজ আর 'সাবধান, সাবধান' রব তাকে টানতে সুরু করল। বুড়ো মিখাইলো কুঁড়েঘরের দরজায় তালা এঁটে পাহাড় থেকে নেমে এল তীরে যেখানে ভেলা তৈরী হয়। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে বিরাট সব গাছ সেখানে গড়িয়ে পড়ে। পরনে তার কাজ করা ছাগলের চামড়ার ভেস্‌ট্‌ আর সাদা ঘরে কাটা পশমের ট্রাউজার, চারটে বকলস লাগান বিরাট চওড়া বেল্টে সেটা বাঁধা। ছোট ছেলের মতো ফোলাফাঁপা চুলগুলো সোজা পিছনে উল্টে আঁচড়ান। জরাজীর্ণ বৃদ্ধটির মুখে কেমন একটা উত্তেজিত ভাব। মিখাইলো ঘুরে ঘুরে ভেলার মাল্লাদের কথাবার্তা শোনে, তারপর দূরে বসে অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রাম করে আর মাল্লাদের কাজকর্ম দেখে।

পেট চালাবার জন্য শ্বেত তিস্‌সার রাজার কাজ ছিল পাইপ বানান। বেশ বিক্রিও হত পাইপগুলো কারণ মিখাইলো বহু

যত্ন করে সেগুলো বানাত। লম্বা ডান্ডায় থাকত নানা রকম সব কারুকাজ। যা টাকা পেত কর্ণ কেনার পক্ষে তা যথেষ্ট। কর্ণ দিয়ে মিখাইলো পাতলা রুটি আর ঝোল বানিয়ে নিত।

* * *

সোভিয়েত সরকার বুড়ো বেলানিয়ুকের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা করল। প্রথম দফার টাকাটা নিয়ে এল গ্রাম সোভিয়েতের একটি মেয়ে, একটা রসিদে বুড়োকে সে সই করতে বলল। বুড়ো আবার লিখতে জানে না। উনুনের কাছে গিয়ে কিছুটা উনুনের কালি বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে টিপসই দিয়ে দিল একটা।

মেয়েটি চলে যাওয়া মাত্র মিখাইলোর মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছুতেই ভেবে পেল না টাকাটা তাকে কেন দেওয়া হল। ভুল হয়নি তো কিছু? ভিক্ষা নয় তো?.. সামনের দরজাটায় একটা খুঁটি ঠেকিয়ে দিল, তাতে বোঝা যাবে বাড়িতে কেউ নেই। তারপর রওনা হল গ্রাম সোভিয়েতের উদ্দেশে। অথর্বের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে হেঁটে চলল পাহাড়ে পথ বেয়ে নিচের দিকে।

গ্রাম সোভিয়েতে তখন লোক গিজগিজ করছে, ঘর তামাকের ধোঁয়ায় ভর্তি। সভাপতি স্তেপান গাসিনেৎস মিখাইলোর পুরনো বন্ধু। মাথায় ফার লাগানো একটা বহুব্যবহারে জীর্ণ টুপি চড়িয়ে ঘরের এক কোণে সে বসে আছে, সামনে তার টেবিল। উদ্বিগ্ন মুখে, ঘর্মাক্ত কলেবরে নথিপত্রের পাতা উল্টে পাশের লোকটিকে

কী সব পড়ে শোনাচ্ছে। পাশের লোকটি নিশ্চয়ই নবাগত কারণ মিখাইলো আগে আর কখনো তাকে দেখেনি। লোকটাকে দেখেই মিখাইলো তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল — কেমন যেন গোমড়ামুখো রাগী রাগী ভাব। তবু টুপিটা খুলে সবাইকে কনুই মেরে মিখাইলো টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল।

'কুমে,'* সভাপতিকে উদ্দেশ করে মিখাইলো বল্‌ল, 'টাকাটা পেয়েছি।'

'ভাল কথা,' সভাপতি তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

'কিন্তু কেন দেওয়া হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'আচ্ছা মুশ্‌কিল কুমে,' সভাপতি রেগে উঠল, 'দেখছ তো আমি ব্যস্ত আর এখন তোমার টাকার গপ্প জুড়েছ। তোমায় টাকাটা দেওয়া হয়েছে, ব্যস, এর মধ্যে আবার গোলমাল কিসের!'

স্তেপান গাসিনেৎসের কাজে ব্যাঘাত ঘটানয় মিখাইলো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ঘর থেকে বেরতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সেই নতুন লোকটি কথা বলে উঠল।

'এক মিনিট দাঁড়ান,' বলে লোকটি গাসিনেৎসের দিকে ভুরু তুলে ঘুরে তাকাল, কপালে মোটা মোটা ভাঁজ পড়ে গেল। 'পেনসনের টাকার কথা হচ্ছে বোধ হয়?'

'আর কিসের টাকা ও পাবে বল?' গাসিনেৎস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

---

* সমবয়সী বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে প্রচলিত ডাক।

'দাদু, সোভিয়েত সরকার আপনাকে এই টাকাটা দিচ্ছে। আপনি তো সারা জীবন কাজ করেছেন, তাই।' কথাটা বলতে বলতে আগন্তুক উঠে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল লোকটি কী অস্বাভাবিক রকম লম্বা।

'তা বটে, সারা জীবন কাজ করেছি, সে কথা ঠিক,' মিখাইলো মেনে নিল, 'প্রত্যেকেই সে কথা বলবে।'

'এখন থেকে প্রতিমাসে তুমি এই টাকাটা পাবে।' গাসিনেৎসের মনমেজাজ হঠাৎ বেশ খুশ্ হয়ে উঠল। 'সোভিয়েত সরকার দেবে, বুঝেছ কুমে?'

'তার ভাল হোক,' মিখাইলো বিড়বিড় করে বলল। তখনো সে ঠিক বুঝতে পারেনি টাকাটা তাকে কেন দেওয়া হবে, তাও আবার প্রতিমাসে! বুড়ো বয়সের জন্য?.. কিন্তু আগে কখনো তো দেওয়া হয়নি। যা হোক এটুকু সে ইতিমধ্যে আঁচ করতে সুরু করেছে যে, আশেপাশের সবকিছুই আগের চেয়ে বদলে যাচ্ছে। নদী আর বনে যারা কাজ করে তাদের কথাই ধর না। এখন তাদের কী কাজের তাড়া, যেন অত্যন্ত ভাল কিছু, আনন্দের কিছু তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। শ্বেত তিসসার বুকে ভেসে যাওয়া ভেলার সংখ্যাও প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। আর কী সব 'পরিকল্পনা', 'প্রতিযোগিতা', 'দন্‌বাস্‌'*

* দনেৎস কয়লা এলাকা।

ওরা বলে, ও সব কথা আগে কখনো কেউ কানেও শোনেনি। বুড়ো বেলানিয়ুক কথাগুলোর মানেই বুঝত না। কিন্তু শ্বেত তিসসার ভূতপূর্ব রাজার পক্ষে কি অল্পবয়সী ছোকরাদের কাছে ও সব জিজ্ঞেস করা সাজে! সমসাময়িক যারা এখনো বেঁচে আছে তারাও তার মতোই যে তিমিরে সেই তিমিরে।

'দাদু, আপনি থাকেন কোথায়?' আগন্তুক লোকটির কথায় বুড়োর ভাবনার খেই হারিয়ে গেল।

'ঐ পাহাড়ে,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বেলানিয়ুক বলল। তারপরেই হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তাতে কী প্রয়োজন?'

'আপনার বাড়ি একবার যেতে চাই, আপত্তি নেই তো?'

মিখাইলো লোকটিকে একবার দেখে নিল। লোকটির সব কিছুই বিপুলাকার: গোছা গোছা সোনালী চুলে ভরা মাথাটা, হাতদুটো, গভীর কোটরে বসানো স্থিরদুটি চোখ—সে চোখে আয়নার মতো মিখাইলো তার নিজের ছায়া দেখতে পেল। লোকটির মুখে এমন একটা সদয় বন্ধুত্বের ভাব রয়েছে যে মিখাইলোর বিদ্বেষ মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই,' মিখাইলো বলল, 'কোন আপত্তি নেই।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' দৈত্যটি হেসে উঠে মিখাইলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

দিনের শেষে নৌবাহিনীর পূর্বতন সাব-অফিসার, বর্তমানে আঞ্চলিক পার্টি কমিটির প্রচারক মাক্সিম গালিচেঙ্কো সত্যিই মিখাইলো বেলানিয়ুকের বাড়িতে এসে হাজির হল। ও ঘরে ঢোকামাত্র কুঁড়েঘরটিতে যেন একেবারে ঠাসাঠাসি লেগে গেল। গালিচেঙ্কো তার ব্যাগটি টেবিলের উপর রেখে কিছু রুটি বেকন আর সিদ্ধ ডিম বের করে বুড়োকেও তার সঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ জানাল। দুজনে নিঃশব্দে খেয়ে চলল। খাওয়া শেষ হলে পর দুজনে বারান্দায় গেল ধূমপানের জন্য।

'আচ্ছা দাদু, আপনিই যে শ্বেত তিস্সার রাজা সে কথাটা আগে বলেননি কেন?' গালিচেঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

'রাজা ছিলাম অনেক কাল আগে,' দুঃখের হাসি হেসে মিখাইলো বলল। 'এখন সব নতুন রাজা হয়েছে। তা ছাড়া রাজা হয়ে লাভটাই বা হল কী?'

মিখাইলো গালিচেঙ্কোকে তার জীবনবৃত্তান্ত বলতে সুরু করল। গ্রামের আর কেউ ঐ গল্প শুনতে চায় না, সবাই ওকথা জানে। সব বুড়োদের মতো মিখাইলোরও পুরনো কালের প্রতিটি খুঁটিনাটি কথা মনে আছে, যদিও গতকালের কথা সে ভুলে গেছে। পুরনো দিনের স্মৃতি তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তার বলার মধ্যে কোথাও অত্যুক্তি বা নিন্দে নেই, যেন অন্য কারো কথা সে কেবল দর্শক হিসেবে বর্ণনা করে যাচ্ছে।

গালিচেঙ্কো তার গল্প শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল, এই ক্ষমতাবান আর সাহসী লোকটিকে কী দারিদ্র্য আর বন্ধনের

মধ্যেই না দিন কাটাতে হয়েছে, কী বিরাট আনন্দ আর কাজ করার সুযোগই না সে হারিয়েছে, অথচ তাতে তার পুরো অধিকারই ছিল। তার বুদ্ধি শক্তি সাহস, তার সবকিছু শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টাতেই ব্যস্ত থেকেছে। মিখাইলো তার নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরাল। দেশলাইয়ের অল্প আলোয় তার শিরা-ওঠা, কর্মশ্রান্ত হাতদুটো গালিচেঙ্কোর চোখে পড়ল। ঐ দুটি হাতে কী মহৎ জীবনই না গড়ে উঠেছিল!

বুড়োর গল্প আর পাঁচজনের মতোই। আগে অনেকবার শুনেছে গালিচেঙ্কো, তবুও ওর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটানর জন্য এতটুকু অনুশোচনা হল না তার। গালিচেঙ্কোর প্রত্যয় হল যে এবার সে বুঝতে পেরেছে, শ্বেত তিস্‌সার লোকেদের সঙ্গে কী ভাবে কী কথা বলা উচিত। এটাই তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ।

ঘরে ফেরার পর মিখাইলো এক টুকরো মোমবাতি জ্বালাল। গালিচেঙ্কো বলল:

'আচ্ছা দাদু, আপনাদের এই নদীতে আরো বড় গোছের ভেলা ভাসান যায়?'

অতিথির দিকে একবার চেয়ে মিখাইলো ভুরু কুঁচকল।

'যৌবনে এখনকার চেয়ে দেড়গুণ বড় একটা ভেলা ভাসিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম একেবারে রাখভো পর্যন্ত চড়ার উপর দিয়ে শুধু নয়, পনের মিটার প্রপাতের ভিতর দিয়ে।'

বেলানিয়ুক ভুরু কুঁচকেই বলে চলল, কেবল কৌতূহলের জন্যই ভেলাটা সে ভাসিয়েছিল। তার বন্ধুরা তাকে আর পরীক্ষা

করতে দেয়নি, অন্ধকারে ধরে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছে। কারণ বড় ভেলা চালু হলে পর তাদের ঐ নগণ্য মাইনে আরো কমে যাবে, এমনকি যেটা আরো খারাপ, বেকার হয়ে বসে থাকার ভয়ও আছে।

'সে অনেক দিনের কথা,' মিখাইলো পরিসমাপ্তিতে বলল, 'তখন খুব গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের ছিলাম।'

তারপর আর কথাবার্তা হয়নি। গালিচেঙ্কো বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে।

এর কয়েক দিন পর বেলানিয়ুকের বড় একা একা লাগতে সে আবার গাছের গুঁড়ি ভাসানর জায়গায় গিয়ে জুটল। বনে ভরা পাহাড়ের গায়ে পথ কাটা হয়েছে, এই সব পথ দিয়েই পাহাড়ের চূড়া থেকে কাটা গাছের গুঁড়ি নেমে আসছে। ক্রমশ তাদের বেগ বেড়ে উঠেছে, একেবারে পাহাড়ের পাদদেশের গর্তে তারা মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রোদে চমকে উঠে প্রচন্ড শব্দ করে নদীতীরে এসে পড়ছে।

দিন তখন শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু নদীর বুকে যতদূর চোখ যায় পুরোদমে কাজ চলেছে।

মিখাইলোকে কে যেন ডাকল। মিখাইলো ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল গ্রামের দিক থেকে এগিয়ে আসছে গালিচেঙ্কো। সুতোয় বাঁধা লম্বা লম্বা পাকান কাগজ তার বগলে। হাতে একটা গাঁটওয়ালা লাঠি।

'এই যে দাদু!' দূর থেকেই গালিচেঙ্কো ডেকে উঠল,

'আপনি এসেছেন খুব ভাল হয়েছে। ছোকরাদের সঙ্গে আলাপ করতে চলেছি।'

গালিচেঙ্কো মিখাইলোর কাছে এসে পড়ল, তারপর দুজনে একসঙ্গে চলতে সুরু করল। ভেলাওয়ালাদের ঘুমবার জায়গা কাঠের কুঁড়েতে ওরা যখন পৌঁছল লোকেরা তখন সব কাজকর্ম সেরে, গায়ের জামা খুলে ফেলে নদীতে গা ধুচ্ছে কিম্বা পরিষ্কার জামায় মাথা গলাচ্ছে। এতদিনে গালিচেঙ্কোকে তাদের ভাল করে চেনা হয়ে গেছে। তাই তাকে দেখেই সবাই ছুটে এল।

'নমস্কার!'

'কেমন আছেন?'

ভেলাওয়ালারা তাদের কুড়ুল করাত ড্রিলগুলো কুঁড়েঘরে রেখে দিয়েই আবার বেরিয়ে এল। তারপর কেউ কাঠের উপর কেউবা সোজা মাটির উপরেই অর্ধবৃত্তাকারে বসে পড়ল।

যারা দেরীতে এল তাদের জন্য অপেক্ষা করল গালিচেঙ্কো। সবাই থিতু হয়ে বসলে পর একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর উঠে দাঁড়িয়ে সে স্বল্পোচ্চস্বরে অত্যন্ত সহজ সাধারণভাবে বলতে সুরু করল:

'কমরেডরা আজ আপনাদের কাছে আমার কথা — সোভিয়েত জনগণ, আমাদের দেশ, তারপর পৃথিবীতে আমরা সবাই কিসের জন্য বেঁচে রয়েছি, এই সব কথাই বলব।'

ভেলাওয়ালারা নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাওয়ি করে পাইপ ফোঁকা থামিয়ে দিল।

গালিচেঙ্কো আবার একটু থেমে হঠাৎ খড়মড় করে তার পাকান কাগজ টেনে খুলে কুঁড়েঘরের বাইরের দেয়ালে টাঙিয়ে দিল।

'এই হচ্ছে ফ্রান্স,' ম্যাপের উপর একটা কাঠের টুকরো বুলিয়ে গালিচেঙ্কো বলল, 'আর এই হল ইংলন্ড — সমুদ্রের বুকে একটা ছোট্ট দ্বীপ, আর এই আমাদের সোভিয়েত দেশ — এই দেশেই আমরা থাকি, কাজকর্ম করি।'

মিখাইলো প্রথম সারিতে বসে একটা কানের পিছনে হাতের পাতাটা ধরে শুনে চলেছে। তা দেখে গালিচেঙ্কো গলা চড়াল। প্রথমে বলল দেশের ধনরত্নের কথা — তার লৌহ আকর শস্য কাঠ প্রভৃতির কথা। বেশ শান্তভাবে অবাধে সে বলে চলেছে। তারপর ম্যাপের কাছ থেকে সরে এসে সে অন্য কাগজগুলো মেলে ধরল। পুরনো আর নতুন পত্রিকা থেকে সযত্নে বাছাই করা নানারকম সব ছবি তাতে লাগান। দেশের নির্মাণের পরিচয় তাতে ছিল, আর ছিল সহরের দৃশ্য, যৌথখামারের ক্ষেত, দেশের বড় বড় লোকদের ছবি। গালিচেঙ্কো বলতে সুরু করল, কী ভাবে একটা মহান স্বপ্ন সত্য হয়েছে, তার ফলে শূন্য স্তেপের বুকে শস্যের সমুদ্র গড়ে উঠেছে, অনুন্নত অঞ্চল সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাখভোর ওপারে উঠতে সুরু করেছে কাগজের মিলের দেয়াল, সাব্-কার্পেথিয়ার ক্ষেতে চলেছে ট্র্যাকটর। গালিচেঙ্কো ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। তার গলা কাঁপছে, আটকে যাচ্ছে,

নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না সে। কিন্তু সে নিজে যা দেখেছে, গড়ে তুলেছে, যুদ্ধের দুঃসময়ে যা রক্ষা করেছে তার কথা শান্তভাবে বলার দরকার কী?

কতক্ষণ ধরে যে সে বলল তা গালিচেঙ্কোর মনে নেই। সন্ধ্যার ছায়ারা এল, চলে গেল। পাহাড়ের উপরে নীল আকাশে শুক্লপক্ষের নতুন চাঁদ। কে যেন এর মধ্যেই আগুন জেবলেছে, তার শিখার আলো পড়েছে শান্তভাবে বসে থাকা লোকগুলোর উপর। অদ্ভুত এক আবেগে তারা শুনছে। সে আবেগ আসে তখন যখন লোকে নিজেদের কথা শোনে অন্যের ভাষায়। তারা বুঝতে পেরেছে এক মহান কাজের জন্য তাদের ডাক পড়েছে, তারা সে কাজ করতে সক্ষম। উপলব্ধি করেছে তিস্সার বুকে তাদের দৈনন্দিন সাধারণ কাজ খুবই বড় কাজ।

গালিচেঙ্কোর বক্তৃতা শেষ হবার পরেও ভেলাওয়ালারা চুপ করে বসে রইল। একজন নড়ে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই সবাই 'হস্স' 'হস্স' করে তাকে থামিয়ে দিল। দুয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ, তারপর একটি মাঝবয়সী গাঁট্টাগোঁট্টা ভেলাওয়ালা অন্ধকার থেকে উঠে এসে আগুনের পাশে দাঁড়াল, চোখদুটো তার কালো, গায়ের চামড়াটাও রোদে পোড়া। মিখাইলো লক্ষ্য করে দেখল: ভাসিল — মৃত মিকলা সুবতার ছেলে।

'চোলি ইভান?' চোখ কুঁচকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাসিল ডেকে উঠল, 'চোলি ইভান এখানে আছ?'

'এই যে!' অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা চড়া গলা শোনা গেল।

'সবার সামনে চোলি, তোমায় আমি একটা কথা বলতে চাই। ভেলা ভাসানয় তুমি আর আমায় হারাতে পারবে না!'

'সে দেখা যাবে,' চোলিও আলোর কাছে এসে বলল, 'চ্যালেঞ্জ করছ তো?'

'হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ করছি,' চোলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাসিল বলল। 'একটি ঘণ্টাও নষ্ট করব না, এতটুকু দেরী নয়, ভেলাটাও এবার আগের চেয়ে দেড়গুণ বড় হবে!'

কথাগুলো শুনে বুড়ো বেলানিয়ুক চমকে উঠল।

'রাজী,' সংক্ষেপে কথাটা বলে চোলি ভাসিলের হাতটা ধরে নেড়ে দিল।

তারপর অন্যেরাও সব এগিয়ে এসে যার যার সঙ্গীদের চ্যালেঞ্জ করতে সুরু করল। একজন খোঁড়া হিসাবলিখিয়ে আগুনের কাছে বসে কেরাণীসুলভ দক্ষতার সঙ্গে নামগুলো খাতায় টুকে নিতে লাগল: সুবতা বনাম চোলি, পপভিচ বনাম গ্রুশচাক, সিরোতা বনাম মাদাই। প্রত্যেকেই মিখাইলোর সমসাময়িক ভেলাওয়ালাদের ছেলে কিম্বা নাতি। বাপঠাকুর্দারা কেউ মারা গেছে, কেউ বা কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছে। কিন্তু তিসসায় তাদের নাম টিঁকে আছে। গালিচেঙ্কো যে নতুন জীবনের কথা বলল সেখানে এই নামগুলো নিজের স্থান পেয়েছে। হয়ত দনেৎস কয়লা এলাকার কোনখানে, কিম্বা

হয়ত খাস মস্কোতেই গালিচেঙ্কোর মতো আরেকজন প্রচারক এই সব নামগুলো তার লোকজনদের কাছে বলবে। কিন্তু বেলানিয়ুকের নাম সেখানে শোনা যাবে না।

বুড়ো রাজার বুকটা ধক্ করে উঠল, তার মনে হল সে যেন সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। জনমানবহীন ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া মানুষের মতো নিজেকে তার বড় একলা মনে হল। জীবন থেকে সে যেন একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রতিযোগীদের নাম পরদিন গ্রাম সোভিয়েতের নোটিশবোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বেলানিয়ুকের নামটা কেউ মিখাইলোকে পড়ে শোনাল না।

সারাদিন সারারাত মিখাইলো তার ঘরেই বন্ধ হয়ে রইল। পাইপ বানাতে চেষ্টা করে কিন্তু হাত থেকে পাইপ খসে পড়ে যায়। পরদিন সকালবেলা সে বেশ কয়েকবার দরজায় খুঁটি আটকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু প্রতিবারই চৌকাঠ ছাড়িয়ে দশ পা গিয়েই আবার ফিরে এল। শেষপর্যন্ত সে সত্যিই বেরিয়ে পড়ল। দুদিনে ত্রিশ কিলোমিটার পথ পার হয়ে পৌঁছল এসে বনের ভিতর রেঞ্জারের বাড়িতে।

বেশ কিছুক্ষণ সে বাড়িটার চারদিকে ঘুরে বেড়াল, কিছুতেই আর মনস্থির করে ভিতরে ঢুকতে পারে না। শেষকালে উঠোনে বাড়ির কাজে ব্যস্ত একটি সতের বছরের ছেলে তাকে দেখল। একটা ঘাস চিবতে চিবতে সে পাহাড়ে

লোকদের স্বভাবসুলভ হালকা মন্থর গতিতে বুড়োর দিকে এগিয়ে এল। তার চালচলন, সদ্য ওঠা দাড়িতে ভরা রোদে পোড়া মুখটি আর তার সরু খাড়া নাক একেবারে পিওতরের মতো। কেবল গোল চিবুক আর কিছুটা পুরু ঠোঁটে মায়ের আদল আসে।

'য়ুরকো আমায় তুমি চেন না?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল, হাতদুটো তার যেন অসাড় হয়ে আসছে।

ছেলেটি বুড়োকে ভাল করে দেখে লাজুক হাসি হেসে বলল, 'ঠাকুর্দা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠাকুর্দাই তো রে,' চিনতে পারায় মিখাইলো ভারী খুসী।

দুজনে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। খালিপা একটি মেয়ে তখন বেঁটে চওড়া চুল্লীটা নিয়ে ব্যস্ত। ছ' আর ন' বছরের দুটি বাচ্চা মেঝেয় বসে একটা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে খেলায় মশ্‌গুল।

ওলিওনা বুড়োকে দেখে চুল্লীর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। মিখাইলো এখানে তা সে ভাবতে পারেনি। পুরনো দিনের অন্যায়ের স্মৃতি এখনো তার মনে জাগ্রত। কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলোর স্মৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়াতে তাদের জ্বালা গেছে কমে।

'বাবা বসুন,' ওলিওনা বলল।

মিখাইলো একবার নাতির দিকে আরেকবার তার পূর্বতনা

পুত্রবধূর দিকে তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করল।

আরেকটি ছেলে এল। য়ুরকোর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। অপরিচিত লোকটিকে নমস্কার জানিয়ে সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তোমার?' ওলিওনাকে মিখাইলো জিজ্ঞেস করল।

'আমার। ইগ্‌নাৎ বেশির ভাগ সময়েই কাজে বেরিয়ে যায়। ও আর য়ুরকোই আমায় ঘরের কাজে সাহায্য করে। এই দেখ, দাঁড়িয়ে রয়েছি, আপনার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে, এতোটা পথ এসেছেন!'

'না, না, একটুও খিদে পায়নি,' মিখাইলো মাথা নেড়ে বলল। আসলে কিন্তু সে সত্যিই ভীষণ ক্লান্ত, তার ভিতরের সবকিছু যেন শুকিয়ে গেছে।

ওলিওনা কিন্তু তার কথা কানেই তুলল না। কিছু রুটি আর এক কাপ দুধ এনে দিল। মিখাইলো কম্পিত হাতে দুধের কাপটা ছুঁয়ে হঠাৎ তার পুত্রবধূর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'ওলিওনা, য়ুরকোকে আমায় দিয়ে দাও!'

ওলিওনা একপা পিছিয়ে গেল:

'বাবা, কী বলছেন আপনি!'

য়ুরকো লাল হয়ে উঠল। অদ্ভুত অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে সে একবার মায়ের দিকে একবার ঠাকুর্দার দিকে তাকায়।

'ওলিওনা, তোমার তো আরো তিনটি আছে, য়ুরকোকে আমায় দিয়ে দাও!' মিখাইলো আবার বলল। তারপর জ্বরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো ভেঙে পড়ল নিঃশব্দ কান্নায়।

* * *

মে মাসের মাঝামাঝি একদিন মাক্‌সিম্‌ গালিচেঙ্কো আর আমি পাহাড়ের কাঠকাটার জায়গা ছেড়ে নিচে নামছি। বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত। আর দাঁড়াতে পারছি না। গ্রামকেন্দ্রে যাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। এত রাত্তিরে কারো বাড়িতে আশ্রয় চাওয়া চলবে না। গালিচেঙ্কো বলল, কাছেই মিখাইলো বেলানিয়ুকের কুঁড়েঘর, সেখানেই রাত কাটান ভাল।

বুড়ো তো আমাদের সাদর অব্যর্থনা জানাল। কিন্তু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল, যেন ভয়, পাছে কারো ঘুম ভেঙে যায়। কেরসিন লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেখতে পেলাম একটা চওড়া বেঞ্চির উপর কে একজন যেন শুয়ে আছে। সোনালি চুলে ভরা মাথাটা পিছনে একটু হেলে পড়েছে, ঘরে বোনা গালিচার তল দিয়ে দেখা যাচ্ছে খালি পাদুটো।

'ঠিক আছে,' বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'ও হচ্ছে য়ুরকো বেলানিয়ুক, আমার বাচ্চা নাতি... একটা বড় ভেলা বানিয়েছে, তাই খুব ক্লান্ত। কাল কী ব্যাপার হবে জানেন তো! কাল য়ুরকো তার প্রথম ভেলা ভাসাবে, বুঝেছেন? জীবনে এই প্রথম!'

বুড়োর গলায় একই সঙ্গে আনন্দ আর উৎকণ্ঠার আভাস পেলাম।

'ওলিওনা শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিল...' মিখাইলো বলল, 'একবছর ওকে সবকিছু শেখালাম, তীর দিয়ে সেই রাখভো পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে প্রতিটি চড়া, প্রতিটি পাথর ওকে দেখিয়ে দিয়েছি... ও খুব ভাল মাল্লা হবে!... যান আপনারা শুয়ে পড়ুন ... আমি বসেই থাকব, আজ আমি কিছুতেই ঘুমতে পারব না।'

মিখাইলোর কাঠের বিছানায় শুয়ে পড়ামাত্র দুজনে গভীর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেল কার হাতের ছোঁওয়ায়। চোখ মেলে তাকালাম। পাহাড় অঞ্চলের সেই অদ্ভুত নীলচে ভোর। ঘরের আধআলো আধছায়ায় দেখতে পেলাম। মিখাইলো আমার উপর ঝুঁকে পড়েছে।

'আমাদের সঙ্গে আপনারাও বোধ হয় যেতে চান নদীতে? গাতিয়ার* স্লুস গেট খুলে দিয়েছে। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?'

বুঝলাম এটা শুধুমাত্র একটা কথার কথা। মিখাইলোর আন্তরিক ইচ্ছে, আমরাও যেন তার নাতির প্রথম ভেলা ভাসান দেখতে যাই।

---

* পাহাড়ে স্লুসগেটরক্ষক।

আমরা তখন ঘুমে মরে যাচ্ছি, কিন্তু তবু উঠে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম। য়ুরকো এর মধ্যেই একটা নতুন ছাগলের চামড়ার গুৎসুল কোট পরে তৈরী। কাঁধে একটা কুড়ুল নিয়ে সে গেটের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কুড়ুলের ডগায় একটা ছোট খাবারভরা কাপড়ের ব্যাগ। আমাদের দেখে য়ুরকো মোরগের পালক গোঁজা টুপিটা খুলে এগিয়ে এল।

'সুপ্রভাত কমরেডরা!'

বেশ ধীরস্থির মর্যাদাপূর্ণ চালচলন। হাঁটেও বেশ হালকা পায়ে নিঃশব্দে।

'তারপর য়ুরকো,' গালিচেঙ্কো বলল, 'ভাসিল সুবতা তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে?'

য়ুরকো লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, 'ভাসিল প্রথমে তো আমার উপর ক্ষেপেই আগুন — আমার মতো একটা বাচ্চা ছেলের এত সাহস ওকে চ্যালেঞ্জ করি। তারপর ভেবেচিন্তে আমার নামের উল্টোদিকে নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছে।'

'সুবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা খুব কঠিন কাজ!'

'তা জানি। কিন্তু ঠাকুর্দা বলেন কঠিন হলেও কিছু আসে যায় না।'

'কিছু ভেব না বাছা, সব ঠিক হয়ে যাবে,' বুড়ো মাথা নেড়ে উৎসাহ দিয়ে বলল।

খাড়া পথ। পাহাড়ের উপরে আকাশটা যেন উল্টোন বাটির মতো। পশ্চিমের আকাশে সবুজ ঘন রঙের মধ্যে কয়েকটা

তারা তখনো মিটমিট করছে। পালকের মতো দুটো সরু ছোট্ট মেঘ আকাশের আলোকিত পূর্বদিক ঘেঁষে ভেসে চলেছে। মেঘ দুটো প্রথমে ছিল ধূসর, তারপর হলদে হতে সুরু করল, শেষকালে হঠাৎ সোনার রঙে ভরে গেল। পাহাড়ের কিনারায় ঘন বন ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এল, মনে হল দূর থেকেও বুঝি গাছগুলোকে গোণা যায়।

লক্ষ্যে যখন পৌঁছলাম পাহাড়ের মাথাগুলোয় তখন রোদের বান ডেকেছে, কিন্তু নিচে তখনো স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার বিমর্ষ ভাব। পাহাড়ের জলাশয় থেকে গাতিয়ারে জল ছেড়ে দিয়েছে। শ্বেত তিস্সা ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ভারী ভেলাগুলো সজীব প্রাণীর মতো অধৈর্য হয়ে উঠে ঢেউয়ের উপর দুলতে সুরু করেছে। এখানে ওখানে ভেলার মাল্লাদের সাদা সার্ট আর টুপির চমক। শেষ মুহূর্তে দেখে নেওয়া হচ্ছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

বুড়ো মিখাইলো দুহাতে লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখদুটো তার বন্ধ। নদীর ভয়ঙ্কর গর্জন শুনছে নাকি অন্য কোন শব্দের আশায় রয়েছে, তা বলা মুশকিল।

'ঠাকুর্দা, এবার যেতে হয়,' য়ুরকো বলল। যাবার সময় ঠাকুর্দা কিছু বলবে ভেবে সে অপেক্ষা করে রইল, বুড়ো কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ, চোখদুটো তখনো বন্ধ। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে য়ুরকোর হাতটা টেনে নিয়ে একবার একটুখানি চাপ দিল।

'চলি!' য়ুরকো আমাদের বলল।

'ভাগ্য সদয় হক!'

জলের ধারে গিয়ে এক মুহূর্ত থেমে য়ুরকো একলাফে ভেলায় উঠে গেল। তার সঙ্গী সেখানে মস্ত লগি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

হঠাৎ নদীর বুক ভরে একটা একটানা দীর্ঘ চিৎকার আর কুড়ুলের ঘা জেগে উঠল। বুড়ো মিখাইলো চমকে উঠে চোখ খুলল। ভেলা বেঁধে রাখার খোঁটা কয়েক জনে তাড়াতাড়ি খুলে দিল। কাঁপতে কাঁপতে ভেলা ভাটির মুখে ভেসে চলল। ভেলার মাল্লারা লগিগুলো তুলে নিল যেন বন্দুক নিয়ে কুচকাওয়াজ করছে। তারপর কাঠের পিছল গা বেয়ে ভেলার সামনের দিকে ছুটে গিয়ে লগিগুলো ছপ্ করে একঝটকায় জলের বুকে নামিয়ে দিল। ভীষণ জোর জল ছিটকে উঠল। ভেলাটা সমান হয়ে নদীর মাঝখানে চলে গেল।

বুড়ো বেলানিয়ুক কয়েকমুহূর্ত দূরে সরে যাওয়া ভেলাটার দিকে চেয়ে রইল। তীরের আর সবার মতো সেও হাত নাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ সে হাতের লাঠিটা ছেড়ে দিয়ে তীরের সবাইকে পিছনে ফেলে পাথরের খোঁচায় হোঁচট খেতে খেতে ভেলার পিছন পিছন ছুটতে সুরু করল। সেই সঙ্গে চেঁচাতে লাগল:

'আমি চললাম ... শুনছ, চললাম!'

বলিরেখায় ভরা মুখটা আবেগ উত্তেজনায় আর বার্ধক্যের চাতুরীতে উদ্ভাসিত। তার পক্ষে দৌড়ন বড় কঠিন। কিন্তু বুড়ো কিছুতেই থামল না, প্রাণপণে ছুটে চলল। সামনে সব কিছু চোখের জলে ঝাপসা। বুড়ো কল্পনায় ভাবছে তর তর করে বয়ে যাওয়া ভেলাটায় যে দাঁড়িয়ে আছে সে তো য়ুরকো নয়, মিখাইলো নিজেই — শ্বেত তিসসা তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ভোরের আলোয় নেয়ে ওঠা দূর উপত্যকার দিকে।

# মণিকাঞ্চন

স্লেগোভেৎস হোটেলের সামনে একটা কাঠের গ‍ুঁড়ির উপর বসে আছে এখানকারই ছ‍ুতোর মিখাইলো স্ম‍ুজেনিৎসা।

বয়স ষাটের কাছাকাছি। পাকাচুল ছোটখাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকটি। ম‍ুঠির সমান ছোট্ট ম‍ুখটি দাড়ি কামাবার

সময় জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে। প্রত্যেক কাটার উপরে সযত্নে সিগারেটের কাগজ আঁটা।

দিনটা রবিবার। স্মুজেনিৎসা তাই তার পুরনো-ধাঁচের চোঙা ট্রাউজার আর পিছনে নীচের দিকে গোল করে কাটা ছোট কোটটা পরেছে। এক সময়ে স্যুটটার রঙ ছিল কালো কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে লেগেছে সবুজের ছোপ।

স্মুজেনিৎসা এক ঘণ্টার উপর ঐভাবেই বসে আছে। সোজা গির্জা থেকে এসেছে। নিশ্চয়ই কারো জন্য অপেক্ষা করছে।

জুন মাসের শেষদিক। পরিষ্কার দিন। সাব-কার্পেথিয়ার সমতলে এখন ভ্যাপসা গরম। চারপাশে পাহাড়ের ঘের দেওয়া স্লেগোভেৎস কিন্তু মাত্র স্বল্প উষ্ণ। গতরাত্রের বৃষ্টির ফলে চারদিক ঝকঝক তকতক করছে। দূরের সব কিছুকে মনে হচ্ছে হাতের কাছেই।

পাহাড়ের গায়ের ঘাসে ঢাকা মাঠগুলো হোটেলের উঠোন থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গিরিদ্বার পর্যন্ত এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া রাস্তার দুপাশে বেড়ার উজ্জ্বল সাদা খুঁটি। রাস্তাটা আর পাহাড়ের পায়ে চলা পথগুলোও নানা রঙে সেজেছে, পাহাড়ে গ্রামগুলোর মেয়েরা সব বিচিত্র রঙের রুমাল স্কার্ট আর এপ্রন পরে স্লেগোভেৎসের দিকে আসছে।

কিন্তু এমন সুন্দর দিনের আনন্দ স্মুজেনিৎসার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। সংসারের সঙ্গে তার বনছে না, দুঃখ তার হৃদয় কুরে খাচ্ছে।

স্মুজেনিৎসার দৃঢ় প্রত্যয়, এতদিন পর্যন্ত সে কোন ভুল কাজই করেনি।

খুব বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হুঁশিয়ার ব্যক্তি সে। সব কিছু অনেক বার ভাল করে দেখেশুনে মেপেঝুঁকে তবে সে কাজ করে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক কাজের আগে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সবাই জানে হুঁশিয়ার লোকের প্রতিই ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

মিখাইলোর যখন অল্প বয়স তখন এই একই ভাগ্য এক ছুতোর কারখানার মালিক ভাসিলি স্ত্রিজাকের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয় কাঠের কাজ শেখার জন্য। স্ত্রিজাক তাকে তার ছাত্র হিসেবে নেয়।

কাপড়ের আলমারি বল, খাট বল, সবই স্ত্রিজাক বানাতে জানত, কিন্তু কফিন ক্রুশ আর গোরস্থানের বেড়া ছাড়া সে কখনো অন্য কিছুতে হাত দিত না।

এই জাতীয় ব্যবসার বিরুদ্ধে মিখাইলোর কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে আবার কফিন ক্রুশ গোরস্থানের বেড়া দু'চক্ষে দেখতে পারত না। স্মুজেনিৎসাকে সে তাই হাঁকিয়ে দিল।

ওস্তাদ তখন তার হতাশ চেলাকে বলল, 'কিচ্ছু ভেব না! আরে নতুন কাপড়ের আলমারি আর খাট কেনার মুরদ আর

কজনেরই বা থাকে বল। লোকে বাপের কাছ থেকে পুরনোটাই পায়। কিন্তু কফিন আর ক্রুশ! এজিনিস বাবা, প্রত্যেকেরই চাই, সারা জীবনে একবার হলেও চাই ... আর ঐ মেয়েটার কথা ভেবো না! আমরা তোমায় আরেকটি খুঁজে দেব এখন!'

এখন আর সে মেয়ের নাম পর্যন্ত স্মুজেনিৎসা মনে করতে পারে না।

স্ত্রিজাকের মেয়ে গাফিয়াকে সে বিয়ে করেছে। বুড়ো স্ত্রিজাক মারা যাবার পর কারখানার মালিক হয়ে বসেছে।

এতে তার কোন ভুল হয়নি, সে তো আপনারাও বুঝতে পারছেন।

স্মুজেনিৎসা একাই কাজ করেছে, কোন সহকারীর তার দরকার হয়নি। ধনদৌলত সঞ্চয়ের চেষ্টা সে কখনো করেনি। চায়নি বলে নয়, ঠিক বাগিয়ে উঠতে পারেনি। এখানেও তার কোন ভুল হয়নি। কাঠের ব্যবসায়ী শান্দর বেইলা স্লেগোভেৎসে দোতলা এক বাড়ি তুলেছিল। ভেবেছিল নিজের জন্যই বুঝি তুলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটা পার্টির জেলা কমিটির হয়ে গেল। স্মুজেনিৎসার ছোট্ট বাড়ি কিন্তু এখনো স্মুজেনিৎসারই আছে।

এমন কি তার কারখানার মাথায় কোনও সাইনবোর্ডও নেই। প্রতিবেশী দর্জি স্তেপান লুব্‌কার মতো নামের লোভ তার নেই। লুব্‌কা কতবারই না সাইনবোর্ড বদলাল। অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ানরা যখন এখানে লুব্‌কা তখন জার্মান ভাষায় সাইনবোর্ড লাগায়।

তারপর চেক ভাষায়। সেটাকেও বদলে হাঙ্গারিয়ান ভাষায় আরেক সাইনবোর্ড টাঙাতে হল। এখন সোভিয়েত আমলে ল্যুব্‌কা একেবারে নতুন সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। এর পিছনে কত টাকা ঢালতে হয়েছে স্মুজেনিৎসা তা হিসেব করে দেখেছে।

স্মুজেনিৎসার যখন চল্লিশ বছর বয়স তখন তার স্ত্রীর একটি মেয়ে হয়। ডাক্তার বলেছিল গাফিয়ার আর কখনো ছেলে বা মেয়ে হবে না।

মিখাইলো তো ঘাবড়ে গেল: সে মারা গেলে তার কারখানায় ক্রুশ আর কফিন তবে কে বানাবে? কে চালিয়ে যাবে তার কাজ? মেয়ে দিয়ে তার কী হবে, সে ছেলে চায় ...

বেশিদিন তার দুঃখ রইল না, শীগ্‌গিরি এই হতাশা সে কাটিয়ে উঠল। কারখানায় ঢুকে একটা ভাল দেখে শুকনো পাটা বেছে নিয়ে সে বসে গেল বাচ্চার জন্য দোলনা-খাট বানাতে, নোটারীর ওখানে যেমনটি দেখেছে ঠিক সেইরকমটি।

এই অসাধারণ আসবাবটি তৈরী করতে গিয়ে তো স্মুজেনিৎসা ঘেমেটেমে অস্থির। কয়েকদিন ধরে সে খাটটির পিছনে লেগে রইল। মেয়ে যাতে অন্তত দশবছর বয়স পর্যন্ত ঐ খাটেই শুতে পারে সে ব্যবস্থা তাতে রইল।

খাটটি তৈরী হবার পর কারখানার মাঝখানে বসিয়ে সে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে সেটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। সজীব মানুষের জন্য এই তার প্রথম কাজ। সেই ক্রুশ আর কফিনের টুকরোর গাদার মধ্যে খাটটাকে অত্যন্ত সজীব আর

উৎফুল্ল মনে হতে লাগল, ঠিক যেন মরা পাথরের বুকে একটি সবুজ ঘাসের শীষ।

এক অদ্ভুত দুঃখ স্মুজেনিৎসার মনটাকে দলিত করে আবার মিলিয়ে গেল।

মেয়েটির নাম রাখা হল আন্না। বাদামী চোখ আর কোমল পেলব মুখাবয়ব নিয়ে সে বড় হয়ে উঠল। আন্না শুনল জীবনটা নানারকম পাপ আর বাধায় ভরা। ফলে সে একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাকে শেখান হল ভগবানকে ভয় করবে আর বাবামার কথার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না।

কিন্তু ভগবান তো সর্বদা ব্যস্ত, তাই পাদরীমশাই আর বাবামাই আন্নাকে ভগবানের হয়ে সবকিছু শেখাতে লাগলেন।

গাফিয়া — যেমনি স্বল্পভাষী তেমনি বিপুলকায় — মেয়েকে নিয়ে সে গির্জায় যেত। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে আধখানা দেয়াল জোড়া একটা কালো বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, বোর্ডের গায়ে নানারকম সব ভয়াবহ ছবি আঁকা। পৃথিবীতে পাপ করলে নরকে কী শাস্তি ভোগ করতে হবে তার ফিরিস্তি। মেয়েটি ভয়ে আঁতকে উঠত। কিন্তু তবু সে পাপ করত ... সে পাপী কারণ গির্জায় দাঁড়িয়েও তার মনটা থেকে থেকেই ভগবানকে ছেড়ে মাঠের দিকে দৌড় মারত... হাঁসের পালকে ঢাকা সবুজ মাঠ — স্নেগোভেৎসের ধার ঘেঁষে চলে যাওয়া ছোট্ট নদীটির তীরে। ওখানে হাঁস পালা হয়। ছোট ছোট মেয়েরা ঐ মাঠের উপর গোল হয়ে বসে কচি গলায়

গান গায়, নেকড়ার তৈরী পুতুলদের দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়। ব্যাপারটা পাপে ভরা হতে পারে কিন্তু মোটেই ভয়াবহ নয়।

স্মুজেনিৎসা তো মহাখুসী, মেয়ে তার কেমন বাধ্য লক্ষ্মী। মনে মনে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, আন্না একদিন বড় হবে, তার বিয়ে দিতে হবে। বেশ নির্ভরযোগ্য সচ্ছল অবস্থা ছেলের সঙ্গেই আন্নার বিয়ে দেবে। কিন্তু সে বহুদূরের কথা, এখন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু একদিন সকালে গাফিয়া ঘুম থেকে উঠে তার স্বামীকে বলল:

'মিথাইলো, দেখ দেখ, আন্না কেমন করে ঘুমচ্ছে।'

মিখাইলো তার পালকের বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খালি পায়ে ঘষটাতে ঘষটাতে দোলনা-খাট্‌টার কাছে এগিয়ে গেল। খাটটা তখন পায়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, যাতে না দোলে।

আন্না সারা শরীর মেলে দিয়ে শুয়েছে। তার ছোট্ট পাদুটো খাটের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

'ছোট হয়েছে,' স্মুজেনিৎসা বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল।

আজই প্রথম তার খেয়াল হল, মেয়ে তার বারো পার হয়েছে। আর পাঁচ বছর পরেই বিয়ের বয়স হয়ে যাবে।

কারখানার এক কোণে দোলনা-খাটটাকে তারা নিয়ে গেল। আন্নাকে পালকের গদি পাতা বড় খাট দেওয়া হল। ভাসিলি স্ত্রিজাকই এককালে ঐ খাটে শুত। স্মুজেনিৎসা আর গাফিয়া

রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটায় উঠে গেল। সেখানে মাচার উপরে তাদের বিছানা পড়ল।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই স্মুজেনিৎসা আর তার বউ বলতে সুরু করল:

'আর ভাই ... বুড়ো হয়ে যাচ্ছি ... মেয়েটারই বলে বিয়ের বয়স হয়ে গেল।'

সেই সঙ্গে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানও করতে লাগল। এ ছিল যেন খেলা, সযত্নে পরের চোখ থেকে লুকোন। সাধারণত রবিবার দিনই এই মৃগয়া চলে। আন্না তখন তার বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বাবামা বাড়িতেই থাকে।

স্মুজেনিৎসা আর গাফিয়া দুটো চেয়ার নিয়ে গেটের কাছে গিয়ে বসে। যেন ফোটো তোলার জন্য পোজ দিচ্ছে আর রাস্তার লোকজন গাড়িঘোড়া দেখে। রবিবারের এই বিনোদন স্মুজেনিৎসার কিন্তু নিজের আবিষ্কার নয়, — এটা প্লেগোভেৎসের বহুদিনের রীতি।

এত দিন স্মুজেনিৎসারা গেটের কাছে নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। কিন্তু এখন আর তা দেখা যায় না। তারা এখন বসে বসে ভাবে আন্নার হবু স্বামী হয়তো হবে ঐ নোটারীটি, কিম্বা ব্যাংকের কেরাণীটি, নয়ত পনির তৈরীর কারখানার মালিকটি। অবশ্য এদের প্রত্যেকেরই বয়সের সংখ্যা থেকে গোটা পনেরক বছর তারা বেমালুম উড়িয়ে দিত। আর আন্না তো তাদের কল্পনায় এর মধ্যেই অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

'...যতদিন ওরা পরস্পরকে ভালবাসবে...' গাফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত।

'আরে বোকা মেয়ে,' মিখাইলো ক্ষেপে উঠত, 'আমায় বিয়ে করার সময় তোমার কী মনে হয়েছিল মনে নেই?'

* * *

কার্পেথিয়ার বুকের উপর ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। বহুশতাব্দীর বড় বড় বীচ আর সিকামোর নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে ভেঙে পড়ল, শিকড়টিকড় শুদ্ধ। দর্জি লুবকা থেকে থেকেই তার দোকানের সাইনবোর্ড পাল্টে চলল। ওদিকে স্মুজেনিৎসা বাড় থেমে যাওয়া, গোঁ ধরে থাকা জুনিপার ঝোপের মতো মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল, এত দুর্যোগেও তার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না।

ঝড়ের শেষ আঘাতে স্মুজেনিৎসা যাদের আত্মার উপযুক্ত মনে করত তাদের অনেকেই কাৎ হয়ে গেল। নোটারীর জন্য — সে হার্টফেল করে মারা যায় — তাকে আবার কফিনও বানাতে হল।

কিন্তু যতই অদলবদল হক স্মুজেনিৎসা তা নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের কিছু মাথা ঘামাল না: খদ্দের আর আত্মাকে নিয়ে আগেকার দুশ্চিন্তাই সবকিছুকে ছাপিয়ে রইল।

স্মুজেনিৎসার হাত দিয়ে সহজে পয়সা গলে না, প্রতিটি পাইপয়সার উপর তার কড়া নজর। কিন্তু মেয়ের বেলা সে ছিল উদার হস্ত।

স্লেগোভেৎসের ঐ অঞ্চলে আন্নার মতো ভাল জামাকাপড় আর কোন মেয়ের ছিল না। রবিবার কেন, অন্যদিনেও সে কনের মতো সেজে বেড়াত। প্রথম প্রথম বেচারী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করত। কিন্তু ক্রমশ সয়ে গেল। সে ভাবতে সুরু করল এই রকমই হওয়া উচিত।

আন্নাকে কোন কাজ করতে দেওয়া হত না পাছে তার হাত নষ্ট হয়ে যায়, নোংরা হয়ে যায়। হাতদুটি জমিদার বাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা ধবধব্ করবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, তবে তো। আলস্যের মধ্যেই কাটত আন্নার নীরস দিনগুলো। তার তরুণ মন ক্রমশ আলস্যের বশে সজীবতা হারাল। প্রার্থনার বই ছাড়া আর একটি মাত্র বই ছিল তার সঙ্গী, ববুল্স্কি'র 'স্বপ্নের বই'। স্বপ্নের ব্যাখ্যা পড়ত আর বইয়ে দেওয়া যাদুচক্রে রুটির ছোট ছোট গুলি ফেলে নিজের ভাগ্য দেখত।

আন্নার যখন সতের বছর বয়স তখন নর্ভাদিমভ্ নামে এক সাইবেরিয়ান সার্জেন্টকে তার মনে ধরল। স্লেগোভেৎসের কাছেরই সীমান্ত ঘাঁটিতে সে পাহারা দিত।

প্রতি রবিবার সার্জেন্টটি স্লেগোভেৎসে আসত বীয়র খেতে আর মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। বেঁটেখাট শক্তসমর্থ লোকটি। মুখে বেশ সরল ভাব। চাউনিটাও বেশ স্বচ্ছ আর

সহজ। মেয়েদের সঙ্গে ভাব করায় সে ছিল ওস্তাদ। কিন্তু কী কারণে যেন আন্নার বেলায় সে লজ্জা পেত, আন্নাও তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এমন হয়ে যেত যে মুখ দিয়ে কথা বেরত না। সবাই বুঝতে পারল সার্জেণ্টটিকে আন্নার মনে ধরেছে। তাই বান্ধবীরা কথাটা কানেকানে চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়ায় এতটুকু দেরী করল না।

এই কানেকানের গুজব স্মুজেনিৎসার কানে গিয়েও পেঁৗছল। সে তো দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। সার্জেণ্টটিকে মিখাইলোরও হয়ত পছন্দ হতে পারত, কিন্তু আন্নার কী প্রয়োজন সে বিষয়ে তার নিজের একটা বিশেষ ধারণা আছে।

মেয়েকে সে ধমকে চেঁচিয়ে বলল, 'ও সব চলবে না, ঐ সার্জেণ্টের কথা ভুলে যাও! ও তোমায় কীইবা দিতে পারবে? ওর না আছে বিত্ত না আছে পদমর্যাদা। নিজের পায়ে দাঁড়াতে ওর এখনো দশটি বছর লাগবে ...'

কেমন ছেলেকে আন্নার বিয়ে করা উচিত সে বিষয়ে সত্যিই স্মুজেনিৎসার নিজস্ব ধারণা আছে। এতদিন যাদের সে জামাই করার যোগ্য বলে মনে করে এসেছে তারা ঝড়ে কুপোকাৎ, সেকথা ঠিক। আন্না যদি দশ বছর আগে জন্মাত তবেই হয়ে ছিল আর কি, কথাটা ভেবেও স্মুজেনিৎসার গায়ে জ্বর আসে। জয় ভগবান! এই ব্যাপারেও তিনি তাকে ভুলের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এরাই যে সমুদ্রের একমাত্র মাছ তা তো নয়।

আজকালও বেশ যোগ্য ছেলে পাওয়া যায়, বেশ ভালভাবেই খেয়ে পরে থাকে তারা, স্বার্থবুদ্ধি তাদেরও কম নয়।

বাবার কড়া নিষেধ শুনে আন্না কাঁদল কিন্তু তা অমান্য করার সাহস তার হল না। বাধ্যতা জিনিসটাকে তার মনের ভিতর তুরপুন চালিয়ে ওক কাঠে পেরেক মারার চেয়েও গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পর পর দু'রবিবার আন্নার দেখা না পেয়ে তৃতীয় রবিবার সার্জেণ্ট নভোদিমভ বেরিয়ে পড়ল ছুতোর বাড়ির সন্ধানে।

স্মুজেনিৎসা সার্জেণ্টের সঙ্গে ভদ্রভাবেই কথা বলল। কিন্তু তাকে জানিয়ে দিল যে আন্নার ইতিমধ্যেই অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, কাজেই আর কোন ছেলের সঙ্গে তার দেখা করার কোন প্রশ্নই এখন ওঠে না।

'তা তো বটেই, তা তো বটেই,' হতাশ সার্জেণ্টটি থেকে থেকেই বলে চলল।

তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল, সার্জেণ্টটির জন্য স্মুজেনিৎসার মনে এমন কি একটু দুঃখও হল।

'ছেলেটি মন্দ নয়,' নভোদিমভের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সে ভাবতে লাগল, 'দেখ কী জাতের মানুষ তার প্রেমে পড়েছে!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির প্রতি করুণায় স্মুজেনিৎসা নিজের উপর রেগে উঠল। 'এরকম হলে হঠাৎ দেখব আন্নাকে কোনদিন হারিয়ে বসে আছি!' তারপর স্মুজেনিৎসা সার্জেণ্টের

কাছে বলা মিথ্যাটাকে যত শীগ্‌গির সম্ভব সত্যি করে তুলতে বদ্ধপরিকর হল।

গাফিয়া ছুটল বুড়ী ঘটকীর কাছে। তারপর গেল নিজনিয়েতে তার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রত্যেকের কাছেই একটি নির্ভরযোগ্য ভাল জামাইয়ের অর্ডার দিয়ে এল।

এক সপ্তাহ গেল। হবু জামাইদের আবির্ভাব হতে লাগল। স্মুজেনিৎসা প্রত্যেককেই নির্দয়ভাবে ফিরিয়ে দিল। একজনের বয়স বড় বেশি ('আন্না অন্যদের দিকে চোখ তুলে তাকাক, তাই চাও বুঝি?'); আরেকজনের পূর্বইতিহাস একটু সন্দেহজনক ('অন্যের ভার বাবা, আন্না কেন নিজের ঘাড়ে নেবে?'); তৃতীয় জন এমন ভাব দেখাল যেন আন্নাকে বিয়ে করে সে স্মুজেনিৎসাকে ধন্য করে দিচ্ছে ('আন্না নিজেই অন্যকে ধন্য করে দিতে পারে')। যৌথখামারের সভাপতিও এসে হাজির, কিন্তু লোকটা মাতাল ('এসব লোক আজকাল আর বেশিদিন নিজেদের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না')।

ব্যাপার বেগতিক। স্মুজেনিৎসা বড় বিষণ্ণ। থেকে থেকেই সার্জেণ্টের ছবিটি তার মনে ফুটে ওঠে, — মাথা হেঁট করে বেচারী চলে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজের উপর রেগে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে স্মুজেনিৎসার বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল। ভেরখনিয়ে গ্রাম থেকে তার জ্ঞাতি ফিওদর তানিনেৎস

এসে হাজির। তানিনেৎস কোন এক অফিসে যেন শিংগ্‌ল্‌ না বোল্ট কেনার কাজ করে। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় যেন সে একাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কথাবার্তা শুনলে মনে হবে তার ঐ শিংগ্‌ল্‌ আর বোল্ট না থাকলে সমগ্র মানবজাতি বোধ হয় বর্বর হয়ে যেত।

'এই যে কুমে! তোমার বাড়িতে আজ রাত্তিরটার জন্য অতিথি আমি!' তানিনেৎস এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল স্মুজেনিৎসা যেন কানে শুনতে পায় না। 'অফিসে একটা বিশেষ জরুরী কন্‌ফারেন্স্‌ হবে। হোটেলে আবার জায়গা নেই। তাই তোমার এখানেই এলাম। আমি কিন্তু একা নই কুমে, আমার এক বন্ধুও সঙ্গে আছে। ভেরখনিয়ের দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান। আরে ভিতরে এস না, কমরেড গিচ্‌কা!'

গৃহকর্তার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই তানিনেৎস এক তেঠেঙে সিঁড়িঙ্গেমার্কা লোককে ভিতরে টেনে আনল। লোকটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সুঁটকো লম্বা মুখ। তার হাসিটা বড় সুন্দর। স্মুজেনিৎসা সঙ্গে সঙ্গে ভেবে ফেলল, 'বেশ চালাক চতুর দেখছি! ব্যবসার ক্ষেত্রে হাসির অসীম মূল্য। হাসি ছড়িয়েই যে কোন লোককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান যেতে পারে!'

স্মুজেনিৎসা তারপর খুঁটিয়ে দেখল লোকটিকে। লক্ষ্য করল লোকটি পথচলার পোষাক পরেনি, — স্যুটটা খাঁটি

উলের না হলেও বেশ ভালভাবে ইস্ত্রি করা। আর সার্ট দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র বদলে এসেছে।

স্মুজেনিৎসা মনে মনে ভাবল, 'লোকটিকে আন্নার জন্যই আনেনি তো?'

তানিনেৎস কিন্তু কিছু বলল না, স্মুজেনিৎসাও কিছু জিজ্ঞেস করল না। কেবল ফিস্‌ফিস্‌ করে গাফিয়াকে বলে দিল আন্নাকে যেন কিছুক্ষণ পরে অতিথিদের নমস্কার করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'ভেরখনিয়েতে তো আপনাকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না,' সবাই বসলে পর স্মুজেনিৎসা বলল গিচ্‌কাকে।

'আমি তো এই সেদিন মাত্র এলাম, এখনো এক বছরও হয়নি,' গিচ্‌কা বলল।

'অনেক দূর থেকে আসছেন বুঝি?'

'না, স্বালিয়াভা থেকে।'

'স্বালিয়াভার চেয়ে ভেরখনিয়ে আপনার বোধ হয় বেশি পছন্দ?'

'ঘটনাচক্রে আর কি,' কথাটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল গিচকা।

'ওর স্ত্রী মারা যায়,' তানিনেৎস বলে উঠল।

'সেটা ঠিক,' গিচ্‌কা বলল, 'ওখানে থাকতে ভাল লাগল না।'

স্মুজেনিৎসা সমবেদনায় মাথা নাড়ল কিন্তু মনে মনে বলল, 'মিথ্যে কথা। পৃথিবীর সব বিপত্নীকই যদি জায়গা বদল করতে

সুরু করে তবেই হয়েছে আর কি..? দোকানের ভার নিয়েছিল, সময় হতে সরে পড়েছে।'

স্মুজেনিৎসা নিন্দা করছিল না। অন্যদের করিৎকর্মতায় সে খুব খুসী হয়, যদিও নিজের তার ঐ গুণটির বড়ই অভাব।

'আপনি তাহলে অনাথ বলুন?' স্মুজেনিৎসা একটু থেমে বলল।

'না না, ও বিপত্নীক,' তানিনেৎস আবার বলে উঠল।

'লোকটা নিশ্চয়ই বিয়ের তালেই এসেছে,' স্মুজেনিৎসা নিশ্চিত হল।

গিচ্‌কাকে তার ভালই লাগল। 'মোটেই বোকা নয়, বেশ ধান্দাবাজ লোক। অবশ্য দেখতে ভাল নয়, তাও ঠিক। কিন্তু তার ফলে আন্নাকে তার আরো বেশি ভাল লাগবে। তাছাড়া ওর চাকরীটিও বেশ লাভজনক। নিজেও তো তুমি গাফিয়াকে বিয়ে করেছিলে। গ্যাফিয়াই বা কোন সুন্দরীটা! প্রথম প্রথম তো তাকালে পিলে চমকে যেত। তারপর ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে গেল, এখন তো কিছুই মনে হয় না।'

আন্না এল। অতিথিদের নমস্কার জানিয়ে নির্লিপ্তভাবে জানলার কাছটায় গিয়ে বসল। মেয়ের উপস্থিতিতে গিচ্‌কার মুখ দিয়ে আর কথা বেরতেই চায় না। এই লজ্জার ফলে গিচ্‌কার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

'আচ্ছা এই ব্যাপার,' গিচ্‌কাকে দেখে স্মুজেনিৎসা ভাবতে

লাগল, 'এমনিতে তো বেশ বলিয়ে কইয়ে লোক, ব্যবসায়ও বেশ দক্ষ, কিন্তু ... আন্নার কাছে তুমি জব্দ থাকবে ...'

গিচ্‌কা থেকে থেকেই চোরাচোখে আন্নার দিকে তাকায়, আন্না কিন্তু একবারও ফিরে তাকায় না। সে জানলার কাছে বসে অলসভাবে জানলার তাকে টবে বসান ফুলগাছের শ‍ুকনো পাতা ছি‍ঁড়ে চলেছে।

জানলা দিয়ে পাহাড় আর তার বৃষ্টি-ধোয়া অফলা মাঠ দেখা যায়। আন্নার মনে পড়ল, তিন বছর আগে সে যখন ইস্কুলে পড়ত ছাত্রছাত্রীরা স্লেগোভেৎসের সব বাসিন্দাদের সঙ্গে এই মাঠে গিয়ে আপেলের চারা লাগায়। যে দশহাজার আপেল গাছ তারা লাগিয়েছিল এবার প্রথম তাদের ফুল ফুটেছে, তার মধ‍ুর গন্ধ বসন্ত সন্ধ্যায় এই ঘরেও এসে পে‍ৗঁছচ্ছে।

গিচ্‌কাকে রাত্তিরটা রান্নাঘরের পিছনের খ‍ুপরিটায় থাকতে দেওয়া হল। গাফিয়া শ‍ুল আন্নার ঘরে। স্ম‍ুজেনিৎসা আর তানিনেৎসের শোবার ব্যবস্থা হল কারখানায় কাজের বেঞ্চিতে।

তানিনেৎসের টর্চের আলোয় ওরা শোবার জোগাড় করছিল। কারখানার অন্ধকার কোণেও একটু ম্লান আলো পড়েছে। দোলনা-খাটটা চোখে পড়তে তানিনেৎস বলে উঠল:

'ওটা কী?'

'দোলনা-খাট।'

'প‍ুরনো ব্যবসা ছেড়ে দিলে নাকি?'

'না, না। ওটা আন্নার। কিনবে নাকি?'

'কেন বিক্রী করছ? আন্নার বিয়ে হবে তখন ওর দরকারে লাগবে।'

'কিন্তু কে ওকে বিয়ে করবে বল?' স্মুজেনিৎসা এমন একটা ভাব করল যেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

'তার মানে? গিচ্‌কা করবে! সে খারাপটা কিসের?'

'না, খারাপ তো বলিনি।'

'ওর সঙ্গে বিয়ে দিলে পস্তাতে হবে না,' বেঞ্চে শুতে শুতে তানিনেৎস বলল। 'ওর টাকার হিসেবটা আমি অবশ্য কষিনি, কিন্তু ভেরখনিয়েতে যার জায়গায় গিচ্‌কা এসেছে সে তো যাবার সময় বোঝাই মাল নিয়ে যায়।'

'তোমার গিচ্‌কা হয়ত বিয়ের কথাই ভাবে না?' স্মুজেনিৎসা জিজ্ঞেস করল।

'বা, তুমি তো আচ্ছা লোক! আমি তোমার কাছে রীতিমত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলাম, আর তুমি এখন "হয়ত" "হয়ত" করছ!'

কিছুক্ষণ পর তানিনেৎস নাক ডাকাতে সুরু করল, সে ডাকে নিশ্চয়ই ভেরখভিনার অপর পারেও পৌঁছেছিল।

তানিনেৎসের ওপর স্মুজেনিৎসার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তবু ভেরখভিনার অন্তত আরো দশজনকে গিচ্‌কার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে সে মনস্থির করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা ঠিক,' সবাই বলেছে, 'লোকটি ভাল, বেশ ধীরস্থির শান্ত। সেলসম্যানও খুব ভাল ... যা চাও তাই ও

জ্বগিয়ে দেবে। ওর আগে যে কাজ করত সে যে অনেক জমিয়েছিল সে কথাও সত্যি।'

তারপর গিচকা তো তার ঘটকদালালকে পাঠাল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আন্নার সে কি কান্না, আত্মহত্যার ভয় পর্যন্ত সে দেখাল। সার্জেণ্ট নভাদিমভ দেখা যাচ্ছে সত্যিই তার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। তারপর বিয়ের পালা...

* * *

...আর এখন জ্বন মাসের এক স্বন্দর দিনে স্মুজেনিৎসা হোটেলের সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে বসে গালাগাল দিচ্ছে তানিনেৎসকে — কেন সে গিচ্‌কাকে তার বাড়িতে এনেছিল; গালাগাল দিচ্ছে নিজেকে — কেন সে লোভে পড়েছিল; আর দিচ্ছে আন্নাকে — কেন সে এত তাড়াতাড়ি কান্না থামিয়ে শেষ পর্যন্ত বাপমায়ের কথা মেনে নিয়েছিল।

মেয়েরা সব দলে দলে কিম্বা একা একা উঠোন পার হয়ে হোটেলের দিকে চলেছে। এরা সবাই এ জেলার দ্বধওয়ালী। স্নেগোভেৎসে সভায় যোগ দিতে এসেছে। স্মুজেনিৎসার চোখের সামনে দিয়ে চলেছে ফুল আঁকা স্কার্ট্, শার্ট আর জ্যাকেট।

স্মুজেনিৎসা সতর্ক হয়ে রয়েছে। চোখ কুঁচকে সে প্রতিটি দলকে ভাল করে দেখছে। যার অপেক্ষায় সে বসে আছে হঠাৎ তার সন্ধান মিলল।

সে তার বান্ধবীদের সঙ্গে উঠোনে গাদা করা ইঁট আর

বালির স্তূপকে বেড় দিয়ে চলেছে। হাতে পাকান খাতা। একটু মোটাসোটা হয়েছে, বেশ একটা উৎসুক ভাব। রুমালের তল থেকে এক গোছা চুল বেরিয়ে এসেছে। চুলের গোছটাকে সে ফু' দিয়ে উড়িয়ে দেয়, রুমালটার তলে ঠেনে দেয় কিন্তু তবু সেটা অবাধ্যের মতো আবার বেরিয়ে আসে।

'আন্না মা!' স্মুজেনিৎসা ডেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আন্না থেমে গিয়ে বান্ধবীদের ছেড়ে বুড়োর দিকে এগিয়ে এল।

'কী খবর বাবা,' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে সে বলল, 'আবার এখানে এসেছেন?'

'কী করব বল? তুই তো আমার পর নস।' স্মুজেনিৎসা গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ওকে ছেড়ে চলে আয়, ছেড়ে চলে আয় ...'

'কেন বাবা?' আন্না কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'আপনায় তো বলেছি আমি বেশ সুখে আছি ওর সঙ্গে।'

'সুখে?' স্মুজেনিৎসা বিমর্ষ এক হাসি হেসে বলল, 'সুখের আর কী রইল বল? অন্য যারা ব্যবসায় নেমেছে, তারা কত পয়সা করল, কিন্তু ওর নামে তো একটা কানাকড়িও নেই। অন্যদের বউরা কেমন পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি আরামে রয়েছে, আর ও কিনা বউকে যৌথখামারে গরু দোয়াবার কাজে পাঠায় ...'

'আমি তো নিজেই গেছি!'

'তা তো হবেই, স্বামীটা যে দুবেলা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও করতে পারে না!'

'দুজনে মিলে তা করব,' আন্না বলল।

বাবার জন্য তার দুঃখ হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বাবার কথায় তার বিরক্তিও লাগে। তার কথাগুলো যে আন্নার পক্ষেই অপমানজনক সে বাবা বুঝতে চায় না। আন্না ঠোঁট দুটো কামড়ে নিজেকে সামলে রাখল পাছে বুড়ো মানুষটিকে কড়া জবাব দিয়ে বসে। কিন্তু স্মুজেনিৎসার রাগ বেড়ে চলল।

'লোকটা আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে আন্না! এখানে এলি, হোটেলে এলি, অথচ তোর নিজের বাড়িঘর বাবামার কাছে এলি না। তোর ফিওদরই বুঝি তোকে বারণ করে দিয়েছে?'

'না,' আন্না বলল, 'আমি নিজে থেকেই এসেছি। আমার স্বামীকে আপনি গালাগাল দেবেন, আমি তা শুনতে পারব না।'

'তা কী করব বল — তোর স্বামীর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা ভিক্ষা করতে হবে? এই তোকে শেষবারের মতো বলে দিলাম আন্না। ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়! বাচ্চা যদি হয় তার ভারও আমরাই নেব ... ঐ ফিওদর তোকে কী মন্ত্রই করেছে কে জানে?'

'আমার জীবন ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।'

'চিত্তাকর্ষক?' স্মুজেনিৎসা জিজ্ঞেস করে হতভম্ব হয়ে

চেয়ে রইল। এতদিন সে জেনে এসেছে জীবন ভালো হয়, সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু চিত্তাকর্ষক?

'সে আবার কোন ধরণের জীবন?'

আন্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'বাবা, আপনি অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। গর্ব ছিল জীবনে কখনো কোন ভুল করেননি। কিন্তু বাবা, সারাজীবনে হয়তো কেবল একটিমাত্র ব্যাপারেই আপনি ভুল করেননি, আমার বিয়ের ব্যাপারে!'

...দিনের শেষে খামারের লরীগুলো দুধওয়ালীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্মুজেনিৎসা দেখল আন্না ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল — এর মধ্যেই তার লরীতে বেয়ে ওঠা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। 'তার মানে বেশী আর দেরী নেই,' স্মুজেনিৎসা ভাবছে। 'আবার দোলনা-খাটটা বেচে দিতে যাচ্ছিলাম ...'

লরীগুলো শেষ পর্যন্ত রওনা হল, ধুলোর মেঘে সব কিছু গেল মিলিয়ে।

ধুলো থিতিয়ে যাবার পর আন্নাকে নিয়ে যাওয়া লরীটা আবার দেখা গেল। এবার অবশ্য নদীর ওপারে। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে চলেছে। একবার এক মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় তারপর হঠাৎ আবার কয়েক মিটার দূরেই আরেকটু উঁচুতে দেখা দেয়। এই ভাবেই চলেছে সেই গিরিদ্বারের দিকে।

স্মুজেনিৎসা কিন্তু তখনো সেই কাঠের গুঁড়ির উপর বসে। ভীষণ মন খারাপ। হয়ত কারো কাছে গিয়ে সব দুঃখ খুলে বললে মনটা হালকা লাগত। কিন্তু হঠাৎ সে বুঝল, এই বিশেষ দুঃখটি প্রকাশ করার মতো কেউ নেই। তার জামাই ফিওদর গিচ্‌কা দেখা গেল সৎ লোক, এ নিয়ে তো কেউ তাকে সমবেদনা জানাবে না, দুঃখ বোধ করবে না …
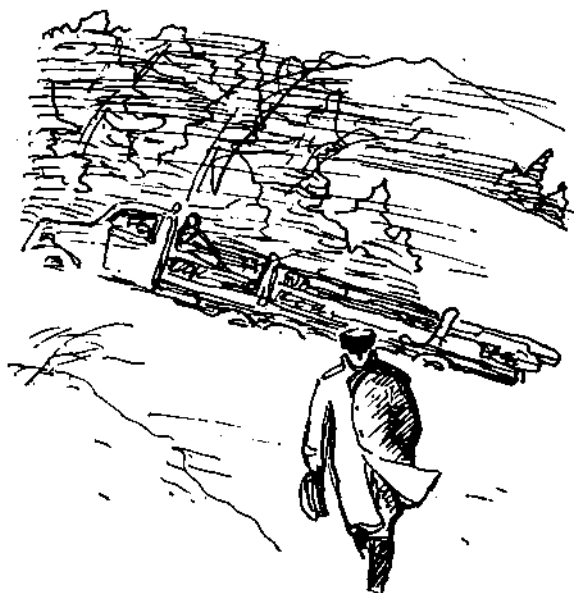
## কর্তব্য

অনেক রাত্রে কে যেন এসে হোটেলে উঠল। অন্ধকারে ঘরের ভিতর সে নড়াচড়া করছে, আমার পাশের ফাঁকা বিছানাটায় শোবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

আধঘুমন্ত অবস্থায় শুনতে পাচ্ছি নতুন লোকটি তার জমে যাওয়া বর্ষাতি চুল্লীর কাছে ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করল,

ব্রীফ্‌কেসটা — নাকি ফীল্ড্‌ ব্যাগ — বালিশের তলে ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানায় বসে মোটা বুটগুলো খুলতে সুরু করল।

বর্ষাতি আর বুটজোড়ায় কড়া হিমের গন্ধ। হিমে বোধ হয় একেবারে জারিয়ে গেছে, তামাকের গন্ধে লোকের জামাকাপড় যেমন হয়।

পুরোপুরি জেগে গেলাম। বিরক্তির সঙ্গে মনে পড়ল তিনদিন ধরে চলেছে জানুয়ারীর সেই সাংঘাতিক বরফঝড়। পাহাড়ের গ্রামগুলোয় গাড়ি ঘোড়া হাঁটাচলা সব বন্ধ।

আমার প্রতিবেশী শুয়ে পড়ল। তার শরীরের ভারে করুণ আর্তনাদ তুলে ঝুলে পড়ল বিছানাটা।

সবকিছু তারপর নিশ্চুপ। আমার চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে ঝড়ের শব্দ শুনছি, যে ঝড় মাঝরাত্তিরে আমার এই নতুন পড়শীকে এখানে নিয়ে এসেছে। লোকটি নিশ্চয়ই কোন কাজে এসেছে।

তারপর ভাবতে সুরু করলাম ছোট্ট সাধারণ একটি কথা 'কর্তব্য' অথচ তার কী অসীম শক্তি। এই একটি কথা, ইচ্ছা ও সময়ের কথা না ভেবে লোককে কাজে উদ্বুদ্ধ করে, দুর্বলকে শক্তি জোগায়, শান্তশিষ্ট লোককে একরোখা করে তোলে। একটা আদেশ দেওয়া হল, অমনি লোকেরা হয় হেঁটে নয় গাড়ি চড়ে বেরিয়ে পড়ল কোথায় কে জানে। একেক সময় এমন সব বাধা বিঘ্ন জয় করে, নিজের ইচ্ছায় বেড়াতে বেরলে লোকে যা কক্ষনো পারত না।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন পুরোবেলা হয়ে গেছে। ঘরের ভিতর আমি আর নবাগত লোকটি ছাড়া আর কেউ নেই।

লোকটি তখন খাটের ধারে বসে মগের চায়ে চুমুক দিচ্ছিল — মিলিসিয়ার এক কট্টর মেজর, মাথাটা পরিষ্কার করে কামান, ভুরুদুটো লালচে।

চোখাচোখি হল। দুজনেই হাসলাম। দুজনেই কেমন একটু যেন অস্বস্তি অনুভব করলাম। দুজনেই দুজনকে অনেক দিন থেকেই দেখে এসেছি, কিন্তু কখনো আলাপ হয়নি।

'জগৎটা ছোট!' বলে মেজর তার ফোলা বসন্তের দাগওয়ালা হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম স্তেপানুাক, ইভান রোমানভিচ।'

স্তেপানুাককে দেখে মনে হল, যারা বুদ্ধির দীপ্তির জোরে বা হঠাৎ দৈবক্রমে উপরে ওঠে সে তাদের দলের নয়। সে হচ্ছে তাদেরই দলে যারা বহুবছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে তবে উপরে ওঠে। এ জাতের লোক খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাজ করে চলে, এদের কাজে বুদ্ধির পরিচয়ও পাওয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতি জিনিসটা এদের কাছ থেকে কেউ আশা করে না।

'এখানে বেশ কয়দিন থাকবেন?'

'না, যাবার পথে এলাম,' স্তেপানুাক বলল, 'সপ্তাহ খানেক

হল এই জেলায় এসেছি। আর একটা গ্রামে এখনো যাওয়া বাকি আছে।'

যে গ্রামের নাম করল সেটা আমি যেদিকে যাব সেইদিকেই পড়ে। কিন্তু ঝড়ে আমি আটকা পড়ে গেছি।

স্লেগোভেৎসে হয়ত আরো কয়েকদিন থেকে যেতে হবে, এই আশংকা জানালে পর স্তেপান্যুক বলল, 'আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার সময় আপনার নিজের হাতে। অথচ আমার হাতে মাত্র দুটি দিন আছে। আজকেই ওখানে যাবার চেষ্টা করব।'

'কী করে যাবেন?'

'কাঠবওয়া গাড়ি ওদিকে যাবে। কাল রাত্রেই ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছি।'

'তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

'আচ্ছা,' মেজর রাজী হয়ে বলল। 'সঙ্গী পেলে হিমও গরম হয়ে ওঠে।'

চা শেষ করে মেজর উঠে পড়ল গাড়ির তদারকীতে।

দাড়িকামান আর জামাকাপড় পরা সারতে সারতেই মেজর ফিরে এল। দুঘণ্টার মধ্যেই একসার কাঠবওয়া গাড়ি রওনা হবে। ড্রাইভাররা হোটেলের সামনে এসে হর্ণ দেবে বলেছে।

মেজর আর আমি ঠিক করলাম এই ঘরেই বসে থাকব। কারণ স্লেগোভেৎসের চায়ের ঘরের কথা মনে করে দুজনেরই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার জোগাড়।

'সত্যিই, চায়ের ঘরটা মোটেই তেমন ভাল নয়,' মেজর বলল। 'অথচ ওটার উন্নতি ঘটাতে কিছুই তেমন লাগে না।'

'কিছু না, কিছু না,' আমি বললাম। 'শুধু খদ্দেরের প্রতি কিছু বিবেচনা, কিছু সম্মান...'

মেজরের মুখ কালো হয়ে গেল। লালচে ভুরুদুটো কেঁপে উঠে ধীরে ধীরে একসঙ্গে হয়ে গেল।

'এ সব আমাদের ত্যাগ করতে হবে,' মেজর বলল, 'এই দপ্তরীদস্তুর কেমন এঁটে থাকে, তার ফলে মানুষ শেষ পর্যন্ত একেবারে চাপা পড়ে যায়, অথচ আমরা বলি, মানুষ কথাটাই নাকি গর্বের বিষয় ...'

এর পরে কথাবার্তা আর জমল না। মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে দুএকটা কথা বলি বটে, কিন্তু তারপর থেমে যাই, — তাতে কোন উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া পাওয়া যায় না। মনে হল স্তেপানুকের মাথায় তখন অন্য কিছু ঘুরছে। সে কথাই সে যেন সারাক্ষণ ভেবে চলেছে। হয়ত কথাটা আমাকে বলার ইচ্ছেও তার আছে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিচ্ছে।

ভদ্রলোককে নিজের মনে থাকতে দেব স্থির করে বহুবার পাতা উল্টোন একটা পত্রিকা টেনে নিতে যাব হঠাৎ স্তেপানুক হাত নেড়ে আমায় থামিয়ে দিল।

'শুনুন একবার কী ঘটেছিল। আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম... হয়ত এজাতীয় ব্যাপার আগেও ঘটেছে, তবু খেয়াল করিনি। যা হোক আপনাকে বলি ব্যাপারটা...

'এই আঞ্চলিক অফিসে নিযুক্ত হবার আগে স্নেগোভেৎসের কাছেরই এক জেলায় কাজ করতাম। সেই মিলিসিয়ারই চাকরী, আবার সি আই ডি বিভাগেই। কাজটা আমার মোটেই মনোরম নয়। মাঝে সাঝে জীবনের এমন কদর্য দিকের সংস্পর্শে আসতে হয়, এমন নোংরা পাঁক ঘাঁটতে হয় যে, বিশ্বাস করবেন না, বাড়ি এসে হাজারবার স্নান করেও মনে হয় তখনো লেগে আছে।

'যা হোক ঐ জেলায় তো কাজ করছি, এমন সময় একটা চুরির কেস্ এল।

'ব্যাপারটা সুরু হল এই ভাবে, এক যৌথখামারের দুবস্তা শস্য একদিন গায়েব হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আশেপাশে বেদম চুরির হিড়িক পড়ে গেল। বোঝা যায় এই সব চুরিডাকাতির জন্য একটি লোকই দায়ী। লোকটি সাহসী, এমন কি মরীয়াও বলা যেতে পারে, সেই সঙ্গে চোখে ধুলো দেওয়ায় দক্ষ। চোরের 'হস্তাক্ষর' দেখে বোঝা যায় সে অনভিজ্ঞ, পেশাদার নয়, কিন্তু তবু কিছুতেই তাকে ধরা যায় না। শুধু লক্ষ্য করে দেখলাম খামারের কামার জিপ্সি ছোকরাটা কয়েকদিন থেকে বেশ নবাবী করে বেড়াচ্ছে — এন্তার মদ খাচ্ছে আর টাকা ছড়াচ্ছে। কিন্তু এখানে বলা দরকার, ওই ছোকরাটি কাজ করত অতি চমৎকার, বেশ ভাল সৎ ছেলে, ফুর্তিবাজ। আর যন্ত্রের কাজে ছিল সর্বদক্ষ।

'ভেরখভিনায় যৌথখামার ব্যবস্থা চালু হবার একেবারে প্রথম দিন থেকেই সে এই খামারে রয়েছে। তার আগে সে

থাকত "প্যারিসে" — নিজ্ নিয়ে গ্রামের বাইরে জিপসি পাড়ার চলতি নাম। দশটা ছোট ছোট মাটির কুঁড়েঘর — এই হল "প্যারিস"... জিপসিরা পেট চালাত গ্রীষ্মকালে বাড়ি তৈরীর খড়ের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে, অন্যান্য ঋতুতে লোহার কাজ করে।

'এই ছেলেটি একদিন যৌথখামারে এসে বলল:

'"আমায় কিছু কাজ দিন, পুরোনো জীবন আমার কাছে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

'"তা তুমি কী করতে পার?"

'"সব কিছু পারি," ছেলেটি বলল।

'সত্যিই সব দিকেই তার বেশ গুণ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সে সবকিছু বুঝে ফেলত, শুকনো গাছে আগুন লাগার মতো আর কি, চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই পুরোটা গাছ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আর কাজ করার খাঁইও তার সাংঘাতিক। একটা সাধারণ এক্সেল তো মাত্র ঝালাই করবে, কিন্তু তাতেই সে সারা কামারশালাকে মাতিয়ে তুলত।

'এই ছোকরা কামারটিকেই আমরা সন্দেহ করতে লাগলাম। সন্দেহ নয়, কিন্তু — কী করে বোঝাই — পাহাড়ে চারণভূমির ব্যাপার জানেন তো: চমৎকার দিন একটুকরা মেঘ বা এতটুকুও হাওয়া হয়নি, তবু বুড়ো রাখাল কোথা থেকে গন্ধ পেয়ে যায় ঝড়জলের সম্ভাবনার।

'এই কামারটির কথা আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তখনো ওকে চোখে দেখিনি। তাই ঠিক করলাম ওর সঙ্গে আলাপ করব।

'ম্নেগোভেৎসে ওকে ডাক পাঠান হল! ছেলেটি যখন ঘরে ঢুকল, ওর দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেলাম, মুখ দিয়ে কথা সরল না ... একটুও বাড়িয়ে বলছি না অমন সুপুরুষ আমি আর কখনো দেখিনি, অথচ ভেরখভিনায় সৌন্দর্য কিছু দুর্লভ নয়। কিন্তু এই ছেলেটির বেলায় প্রকৃতিমাতা নিশ্চয় বলেছিলেন, "এই নাও, অবাক হয়ে চেয়ে দেখ আমার সৃষ্টিকে! কেমন?"

'দীর্ঘকায় সমুন্নত ছেলেটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, এককাঁধে জ্যাকেটটি ঝোলান। রঙ অল্প ময়লা, কিন্তু তাতে কালোর চেয়ে সোনালি ভাবটাই বেশি। বাদামী চোখদুটো জ্বলছে যেন হাপরের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে তার চোখে পড়েছে, তারপর নিভে না গিয়ে সেখানেই রয়ে গেছে, আর ভেতরের কী এক বাতাসের তরঙ্গে সর্বদা দীপ্ত হয়ে রয়েছে।

'অত্যন্ত আকুলভাবে বারবার মনে মনে বলতে লাগলাম — এ ছেলে যেন চোর না হয়।

'অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'"মেদ্ভিয়ানিৎস্কি দোকানের চুরির বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?"

'"জানি," ছেলেটি শান্তভাবে জবাব দিল।

'"অক্টোবর যৌথখামারের?"

'"জানি।"

'প্রত্যেকটি চুরির কথা জিজ্ঞেস করলাম। প্রত্যেকবার সে বলল, "জানি।"

'“এ সব কে করেছে বলতে পারেন ?” ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম কথাটা।

'“আমি।”

'সাঁ করে যেন কে আমার গায়ে চাবুক কষিয়ে দিল।

'মনে হল বোধ হয় ভুল শুনেছি। হয়ত মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কিম্বা হয়ত আমার সঙ্গে মজা করার জন্যই বলেছে কথাটা। কিন্তু না, ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি কথাই বলছে। আগের মতোই সে শান্ত, এমন কি নির্লিপ্ত। কেন জানি না তখন জিজ্ঞেস করে বসলাম:

'“আপনাদের খামারের দুবস্তা শস্য ?”

'হঠাৎ ছেলেটি এমন একটা ভাব করে উঠল যেন তাকে ভীষণ একটা কিছু ঘা দিয়েছি, রাগে তার চোখদুটো জ্বলে উঠল।

'“না !” ফোঁস ফোঁস করতে করতে সে চেঁচিয়ে উঠল, “ও বস্তা আমি চুরি করিনি !”'

মেজর থামল, নেড়া মাথাটা একবার জোরে ঘসে নিল। একটু থামার পর ধীরে ধীরে বলল:

'ব্যাপারটা হল এই। বস্তাদুটো একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন উপে গেছে।

'খামার কমিটি সভা ডেকে প্রচুর মাথা ঘামিয়ে বের করতে চেষ্টা করল: কে নিতে পারে বস্তাদুটো। সভাপতির মুখখানা তো রাত্রির চেয়েও অন্ধকার; পার্টি সম্পাদক তো একবাঁও

জলে। "সন্দেহ করার মতোও কেউ নেই," সে বলল। তখন ফোরম্যানদের একজন উঠে বলল, "ঐ জিপসিটা ছাড়া আর কাকেই বা সন্দেহ করা যায়?"

'লোকটিকে কেউ সমর্থন করল না কিন্তু (সেটাই সবচেয়ে প্রধান ব্যাপার) কেউ তাকে দমিয়েও দিল না। এদিকে সবাই জানে জিপ্সি ছেলেটি সৎ, চমৎকার কাজের লোক। এরকমই হয় একেক সময়...

'ছেলেটি তার প্রতি এই অন্যায়ের কথা শুনে অপমানে লাল হয়ে উঠল। বদমেজাজী লোক। "তোমরা তাহলে আমায় চোর বলে মনে কর, আচ্ছা, তবে আরো কিছু দেখ!" ক্ষেপে গেল সে। তারপর সুরু হল একের পর এক চুরি ...

'খামারের এই ইতিহাস শুনে ছেলেটির প্রতি আমার এমন প্রচন্ড রাগ হল, কী আর বলব, রাগের চোটে আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না:

' "তুমি একটা অমুক তমুক সেমুক, তুমি একটা হতভাগা ইত্যাদি ইত্যাদি... তুমি মোটেই ক্ষমার যোগ্য নও। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে তোমায় চুরির জন্য নয়, নিজের আত্মসম্মানকে এইভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য সাজা দিতাম। আমার কাছ থেকে এতটুকুও দয়া পেতে না। কার জন্যে তুমি একাজ করছ? ঐ বোকা ফোরম্যানটার জন্য? এতই দরাজ হয়েছ যে নিজের সম্মানটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে?

আর এ কি শুধু একা তোমার সম্মান? তোমার স্বজাতিরা নতুন জীবনের পথ বের করছে, কাজটা মোটেই সহজ নয়, আর তুমি ওদের এরকম ক্ষতি করলে ... ঐ ফোরম্যান তোমায় জিপসিটা বলেছিল, কিন্তু পুশ্‌কিন, গোর্কি আর তলস্তয় জিপ্‌সিদের বিষয়ে কী লিখে গেছেন তা জান? জিপসিরা গুণী, স্বাধীনতাপ্রিয় আর মর্যাদাবোধসম্পন্ন বলে তাদের কত প্রশংসা তাঁরা করে গেছেন, তা তুমি জান? না না, আমার কাছ থেকে করুণা আশা কর না!..”

‘সত্যিই, এ ব্যাপারে করুণার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। লোকটিকে বাঁচাতেই হল। চুরি জিনিসটা মদ খাওয়া বা জুয়াখেলার মতো মানুষকে পেয়ে বসে, অভ্যাস হয়ে যায়, নেশা ধরে, অভ্যাস কাটান বড় সহজ ব্যাপার নয়।

‘কয়েকদিন পরেই এই মামলার শুনানী সুরু হল। আমিও আদালতে গেলাম। জজের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ছেলেটি দিল অত্যন্ত অনিচ্ছায়। তার শেষবক্তব্য তো সে একেবারেই বলতে রাজী হল না। আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল, যেন আমিই সবকিছুর জন্য দায়ী।

‘ঘটনাটা ঘটে প্রায় ছ’ বছর আগে। ও জেলা থেকে আমি উজগরদে বদলী হয়ে যাই। আর সত্যি বলতে কি, ঘটনাটা ক্রমে ভুলে যাই। তারপর হঠাৎ ভেবে দেখুন, এই গত সপ্তাহে, অফিসে বসে কাগজপত্তর দেখছি এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'"আসুন," আমি বললাম।

'দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল আমার পুরোনো বন্ধু, সেই কামার ছেলেটি।

'"আমায় আপনি চেনেন কমরেড মেজর?"

'"তা চিনি বই কি। ফিরেছেন তাহলে।"

'"হ্যাঁ, মেয়াদ ফুরল।"

'"তা আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন?"

'আমার দিকে একবার অদ্ভুত ভাবে তাকাল ছেলেটি। কী বলবে ভেবে পেল না।

'"কিচ্ছু না কমরেড মেজর। আমি কেবল... এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম... অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার কাজের ব্যাঘাত করলাম।"

'"ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

'এইটুকুই। ও তো চলে গেল। আমিও আমার কাজে লেগে গেলাম। কাজ করে চলেছি, লিখছি, পড়ছি আর ভিতরে ভিতরে একটা উৎকণ্ঠা জেগে উঠছে। মনটা থেকে থেকেই ঐ জিপসির দিকে ছুটে যাচ্ছে। "ও কেন এল? এত কষ্ট করে আমায় খুঁজে বের করেছে, এর একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ও খুব উৎসুক ছিল... হয়ত ওর সাহায্যের প্রয়োজন? কিন্তু জিজ্ঞেস তো করলাম, ওর জন্য কিছু করতে পারি কিনা, ও বলল কিছুই দরকার নেই... তবু নিশ্চয়ই কোন কারণে এসেছিল।" হঠাৎ ভীষণ বিশ্রী লাগতে

লাগল, অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলাম। পথ দিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলার সময় হঠাৎ কেউ আপনায় নমস্কার করল, অথচ আপনি তখন এতই চিন্তামগ্ন যে ফিরে নমস্কার করলেন না। অনেক পর ব্যাপারটা আপনার খেয়াল হল তখন যেরকম বিশ্রী লাগে এও ঠিক সেইরকম ... "আপনার জন্য কী করতে পারি?" ... কিন্তু ও তো আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসেনি। আমার কাছে ও কিছুই চাইতে আসেনি। কেবল দেখা করতে এসেছিল। কাউকে "এমনি" দেখতে যাওয়াই একেকসময় অত্যন্ত অর্থবহ হয়ে ওঠে কারো কারো কাছে। আর আমি কিনা তাকে এরকমভাবে অভ্যর্থনা করলাম।

'বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সে তখন চলে গেছে। রাস্তায় দৌড়লাম, কোথাও তাকে দেখা গেল না। এখন কী করি? ঠিক করলাম ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। ওর এই দাক্ষিণ্যের উপযুক্ত প্রতিদান দিতে হবে।'

স্তেপান্যুক তার গল্পের শেষে আরো কী যেন যোগ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ড্রাইভারের হর্ণের দীর্ঘ চাপা আওয়াজ ভেসে এল।

'ঐ আমাদের ডাকছে,' মেজর লাফিয়ে উঠল। 'জামাকাপড় পরে নিন।'

... এক ঘণ্টারও উপর তিনটে কাঠবওয়া গাড়ি ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন তুলে বরফঢাকা পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। স্নেগোভেৎস থেকে কতদূর এসেছি তা একবার

আঁচ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে অসম্ভব ব্যাপার। বাতাস শীস্‌ দিয়ে সপাং করে চাবুক চালিয়ে বরফকুচির ঝড় তুলছে। সেই দুর্ভেদ্য বরফের মেঘের কী মারাত্মক হিমশীতল কামড়!

গাড়ির কামরায় আমাদের জায়গা হল না। মেজর আর আমি খোলা পাটার উপরেই বসেছিলাম। মারাত্মক শীতে জমে ঠান্ডা হয়ে গেছি।

'এখনো বেঁচে আছেন?' স্তেপানুক থেকে থেকেই জিজ্ঞেস করতে থাকল।

'এখন পর্যন্ত তো আছি,' কোনরকমে চাপা স্বরে উত্তর দিয়ে মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিয়ে চললাম, 'কী দরকার ছিল আসবার? ও যাচ্ছে — ওর কাজ আছে, আমার কী দরকার ছিল? স্লেগোভেৎসে থাকলেই তো হত!'

সময় ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে, এর আর যেন শেষ নেই। এটা সেটা নানা কথা ভাববার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু ভাবনাগুলোও ঠান্ডায় যেন জমে গেছে। স্লেগোভেৎস হোটেলের আমার সেই কোণটাকে তখন সাক্ষাৎ স্বর্গ বলে মনে হচ্ছিল।

'এখনো বেঁচে আছেন?'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে।'

অবশেষে ব্রিজ পেরল ... আমাদের ডাইনে রাস্তার ঠিক ধারে একটা লম্বা ক্রুশ চোখে পড়ল, যীশু খৃষ্টের একটা মর্চে

পড়া টিনের প্রতিকৃতি তাতে লাগান। তারপর বরফে ঢাকা একটা কী যেন চলে গেল, হয়ত ঘাসের গাদা নয়ত কারো বাড়ি।

'এই তো!' মেজর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'বোধ হয় পেঁৗছে গেছি!'

উঠে পড়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল, তারপর ড্রাইভারের কামরার চালে দমাদম কিল মারতে সুরু করল।

'কী হল?' মাথা বের করে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

'এখানে থামাও গাড়ি!' তারপর আমার দিকে ঘুরে মেজর বলল, 'আচ্ছা, তবে আসি, নমস্কার। সেই কামার ছেলেটির খোঁজ করব। শুনেছি সে এখানেই যৌথখামারে কাজ করে।'

লরীটা থেমে গেল। স্তেপানুক ধপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ে তার ফীল্ড্ ব্যাগটা নেড়ে বিদায় জানাল।

আমি সেই একই খোলা পাটায় বসে একা একা চলতে লাগলাম, কিন্তু সত্যি বলছি, ঠাণ্ডাটা আর আগের মতো অসহ্য মনে হল না।

## ঝরণা

স্নেগোভেৎসের উপকণ্ঠে আসতেই ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল।

চারিদিক অন্ধকার। বৃষ্টির পর্দার আড়ালে পাহাড়গুলো ঢাকা পড়ে গেছে। ধুলোর প্রচণ্ড ঘূর্ণি রাস্তা থেকে লোকের

ফেলে যাওয়া ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর কাটা ঘাসের গোছা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়ল রাস্তায়। এক মুহূর্তের মধ্যেই রাস্তার গা বিচিত্র ফোঁটায় ভরে গেল।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য কাছের বাড়িটার দিকে আমরা দৌড় মারলাম। কাঠের গুঁড়ির বাড়ি। বহু পুরনো কালের চালটা সবুজ শ্যাওলায় সম্পূর্ণ ছেয়ে গেছে। রাস্তার লেভেলের নিচেই বাড়িটা দাঁড়িয়ে। মাটির গায়ে কয়েকটা সিঁড়ি, পাশটা পাথরের তৈরী, চলে গেছে দরজা পর্যন্ত।

লাফ দিয়ে বাড়িটার প্রবেশপথে ঢুকেছি এমন সময় অন্ধকার চিরে চমকে উঠল বিদ্যুৎ। মনে হল কেউ যেন রূপকথার দেশের গাছের সোনার আঁকাবাঁকা শিকড় মাটি থেকে উপড়ে এনে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছে।

মাটি কেঁপে উঠল, মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

প্রবেশপথ থেকে ঘরে ঢোকার দরজাটা আধভেজান। মনে হল ভিতরে কেউ নেই। তবু দরজার সামনে থেমে হাঁকলাম:

'আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' কে যেন ধরা গলায় জবাব দিল, 'আসুন।'

রুকস্যাক আর লাঠিগুলো বাইরেই রেখে দিলাম। পাহাড়ের চারণভূমিতে রাখালদের কাছে গিয়েছিলাম, রুকস্যাক আর লাঠিগুলো যাত্রাপথে খুবই কাজ দিয়েছে। আমরা ঘরে ঢুকলাম।

বেশ সাজান গোছান ঘর, কিন্তু বড্ড যেন ফাঁকা ফাঁকা। আসবাবপত্র বলতে তো কেবল একটা টেবিল, দুটো বেঞ্চি আর

চুল্লীর কাছে একটা বিরাট কাঠের খাট। বছর ষাটেকের একটি লোক খাটের উপর বসে। হাড় বের করা গোমড়া মুখ। কাঁধের উপর একটা ছাগলের চামড়ার কোট চাপান, পাদুটো ফিতে না লাগান ভারী বুটের ভিতর ঢোকান।

গৃহকর্তার মুখ দেখে মনে হল আমরা আসায় তাঁর মনে কোন ভাবেরই উদ্রেক হয়নি, এমন কি সাধারণ কৌতূহলও নয়।

'বসুন,' ভদ্রলোক বললেন। গোঁফে ঢাকা মুখের ভিতর একটা ঘরে তৈরী লম্বা পাইপ পুরে ধূমপান করতে লাগলেন।

ঝড় একেবারে ঘরের চালের উপর দিয়েই গর্জন করে ছুটে চলেছে। একেকবারে বাজ যখন পড়ে তখন কাঠের বাড়িটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, দেয়ালে ঝোলান ছোট্ট তাকটায় সামান্য যা বাসনপত্তর রয়েছে সেগুলো ঠুংঠাং আওয়াজ তোলে।

ভদ্রলোক কিন্তু যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। আমরা বা ঝড় — কারো প্রতিই তাঁর কোন খেয়াল নেই। থেকে থেকেই কেবল কাঁধের কোটটা সোজা করে নেন, আর অদ্ভুতভাবে দুহাত দিয়ে ধরে এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দেন।

'আপনি কি অসুস্থ?' আলাপ সুরু করার চেষ্টায় বললাম।

'হ্যাঁ,' ভদ্রলোক বিশেষ গা না লাগিয়ে বললেন।

'কী হয়েছে?'

ভদ্রলোক আমায় একবার দেখে নিলেন। বোধ হয় উত্তরটা দেওয়া উচিত হবে কি না সেটাই সমঝে নিলেন। তারপর কিছু অনিচ্ছার সঙ্গেই বললেন:

'পাদুটো নিয়ে ভুগছি।'

'অনেকদিন থেকেই ভুগছেন?' আমাদের দলের ডাক্তারী ছাত্রটি বলে উঠল। উজগরদে তার বাস। রোগীকে তখন তখুনি সাহায্য করার জন্য সে বিশেষ উৎসুক।

বুড়ো ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে রইলেন।

'ট্রেঞ্চে থাকতেই সুরু হয়, সেই প্রথম জার্মানযুদ্ধে।'

খাঁটি রুশী ধাঁচের কথা: 'জার্মানযুদ্ধ'। রাশিয়ার অভ্যন্তরে এখনো বুড়োদের মধ্যে 'জার্মানযুদ্ধ' কথাটা প্রচলিত।

'আপনি এখানকার লোক নন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এখানকারই লোক, তবে রাশিয়া থেকে এসেছি।'

'এখানে অনেকদিন আছেন কি?'

'১৯১৫ সাল থেকে। যুদ্ধবন্দী।'

'তারপর আর বাড়ি ফিরে গেলেন না কেন?'

'এমনি,' ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এখানকার লোকরা তো আর আমাদের পর নয় ... বিয়ে করলাম ... ছেলেপুলেও হল... দেশে আমার কেউ ছিল না।'

'আপনি কোন অঞ্চল থেকে আসছেন?' জিজ্ঞেস করল আন্না মামুলিয়া। পশুপালনবিদ সে, ওই আমাদের রাখালদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

'আমি স্মলেনস্কের লোক,' বুড়ো একটু চাপা স্বরে বললেন, 'পুনেভো গ্রামে বাড়ি।'

আমি চমকে উঠলাম।

'ওগ্রিজ্‌কভোর কাছে কি? এই গেল বছরই তো আমি সেখানে গিয়েছিলাম।'

গৃহকর্তার মুখে কোন বিকার নেই। আমার কথা তাঁর মনে কোনই রেখাপাত করতে পারল না। অথচ পরে তাঁর সংক্ষিপ্ত কাটাকাটা জবাব শুনে জানতে পারলাম ভদ্রলোক পুনেভোতেই জন্মেছিলেন। এমন কি কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত, তার মানে মিলিটারীতে ডাক পড়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

ভদ্রলোক নিজে আমাদের কোনরকম প্রশ্নই করলেন না। আমাদের প্রশ্ন ফুরিয়ে যেতে যে খুব দুঃখ পেলেন তাও মনে হল না। এ কি জীবনে বহু ঘা খাওয়া মানুষের উদাসীনতা? ভিতরের সবকিছু যার ক্ষতবিক্ষত হয়ে অসাড় হয়ে গেছে, কোন আনন্দই, এমনকি স্মৃতির আনন্দও সেই অসাড়তাকে আর ভেদ করতে পারে না। নাকি নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত মানুষের সতর্কতা? কিম্বা হয়ত অসুস্থতার ফলেই ভদ্রলোক বৈরাগ্যের সেই স্তরে এসে পৌঁছেছেন যেখানে অসুস্থতা ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিই তাঁর সাড় নেই? হয়ত এ সবকিছু মিলিয়ে এরকমটা হয়েছে?

এরপর থেকে আমরা কেবল নিজেদের কথা বলে চললাম — হোটেলে চিঠিপত্তর কিছু পড়ে রয়েছে কি; আসছে কাল আবার ডাক্তারী ছাত্র যুরি লকতার বক্তৃতা আছে স্নেগোভেৎসের কাছে তার নিজেরই গ্রামে; পাহাড়ে চারণভূমিতে

যৌথখামারের পাল চরায় যে রাখালরা তাদের অভাব অভিযোগ ইত্যাদি নানা কথা বলে চললাম, আমাদের স্বল্পভাষী গৃহকর্তার প্রতি কোন নজর দিলাম না।

ঝড় তখন গিরিদ্বারের ওপারে পেঁছেছে। ছোট্ট জানলাটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ঝড় তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলেছে বৃষ্টির ধোঁয়াটে ধারা। অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। পাহাড়ের উপরে নীল আকাশের একটি রেখা ফুটে উঠে ক্রমশ ব্যাপকতর হয়ে উঠল। এক ঝলক রোদও দেখা দিল, কিন্তু ঝিরঝিরে এক পশলা খুসিমাখা বৃষ্টি তখনো পড়ে চলেছে।

এবার বেরন যেতে পারে। গৃহকর্তাকে বিদায় জানালাম। তিনি পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে মাথাটা একবার নেড়ে দিলেন।

বৃষ্টি একেবারেই থেমে গেল। বাইরেটা গরম আর ভ্যাপসা। ছোট ছোট জলধারা রাস্তা বেয়ে ঝরে পড়ছে। উচ্ছল তাদের কলকণ্ঠ। উজ্জ্বল তারা সোনার রোদ মেখে। রাস্তায় জমা কাদা জলের ডোবা আর এইসব জলধারা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে আমরা সহরের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। আন্না মামুলিয়া বাড়ি চলে গেল। আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

সবকিছু গোছগাছ করা, কাপড় ধোওয়া, নিজেরা তৈরী হয়ে নেওয়া, এতেই প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। লকতা তার গ্রামে যাবে, আমি ঠিক করলাম তাকে চৌমাথা পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসব।

নিচে নামার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়েই খাড়া কাঠের সিঁড়ির মাথায় আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম: এক হাতে লাঠির উপর ভর দিয়ে, আরেক হাতে সিঁড়ির রেলিং ধরে উঠে আসছেন সেই ভদ্রলোক ঝড়ের সময় যাঁর বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম।

বহু কষ্টে একপা একপা করে ভদ্রলোক উঠছেন। কী রকম ভয়ানক কষ্ট করতে হচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছি। হাড় বের-করা মুখটা ঘামে ভিজে গেছে; চোখের উপরেও দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে। ঘরে কাটা সুতোয় তৈরী সার্টের হাতা দিয়ে ভদ্রলোক থেকে থেকে ঘাম মুছছেন।

তাঁর আগমন এতই অপ্রত্যাশিত, এমনকি অবিশ্বাস্য যে, আমরা দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

নিশ্চয়ই অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার। নইলে কি এই অসুস্থ ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে এত কষ্ট করে হোটেল পর্যন্ত আসেন? ওঁর বাড়ি থেকে হোটেলটা এক কিলোমিটারের কম তো নয়ই।

আমাদের দেখে ভদ্রলোক থামলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন:

‘পুনেভোতে কখন গিয়েছিলেন?’

‘গত গ্রীষ্মে।’

‘গ্রীষ্মে ...’ ভদ্রলোক ধরা গলায় বলে উঠলেন। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকোলেন, যেন দূরে কিছু একটা

দেখার চেষ্টা করছেন কিন্তু চোখ ধাঁধান রোদের জন্য দেখতে পারছেন না।

'ওখানে একটা টিলা আছে,' অবশেষে ধীরে ধীরে বলে চললেন, 'ছোট বেলায় সেখানে কত নাক্‌ল্‌বোন খেলেছি... টিলাটার ঠিক তলে একটা ঝরণা। ঐ ঝরণার কাছে ছিল আমাদের বাড়ি ... আহা, কী সুন্দরই না ছিল!..'

আর কিছু বললেন না, ঘুরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নামতে সুরু করলেন।

...লকতার গলার স্বরে আবার ইহজগতে ফিরে এলাম।

আমার হাত ধরে সে বলল, 'বলুন, সত্যিই কি জায়গাটা খুব সুন্দর?'

'খুবই সুন্দর!' আমি বললাম যদিও মনে মনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম সেই বিশ্রী মরচে রঙের টিলাটা, জলাভূমির মাঠের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য ঝরণাটা আর সেই পাৎলা অনুচ্চ বনের ভিতর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা নেড়া কুৎসিৎ গ্রাম। মনে পড়ল পুনেভোর অধিবাসী সবাই এখন এর চেয়ে ভাল জায়গায় সরে যাবার কথা ভাবছে।

## এতো সবে আরম্ভ

১

বুড়ো ভাসিল য়াৎসিনা ছ মাস হাসপাতালে ছিল। প্রতিদিনই তার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ডাক্তাররা আর কিছুই করতে পারছিল না। য়াৎসিনা তখন তার গাঁয়ে ফিরে যাবার অনুমতি চাইল, ভেরখভিনাতেই সে মরতে চায়।

মরতে সে ভয় পায় না, স্বর্গরাজ্যের উপর আস্থা রেখেই সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

ভাসিল ভাবতে লাগল, 'সারা জীবন এত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি — না আছে ঘরবাড়ি, না আছে নিজের জমিজমা, গোরুঘোড়া, — এর ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ঘটবে ... সারা জীবন তো কেবল অজানা অচেনাদের দ্বারে দ্বারে কাজ মেগে বেড়িয়েছি ...'

'কিন্তু তবু সে ওস্তাদ কাঠুরে। অমন ওস্তাদ বড় একটা দেখা যায় না। ভাসিল য়াৎসিনার সঙ্গে গাছ কাটায় পাল্লা দিতে পারে সাব-কার্পেথিয়ান পাহাড়ে এমন আর কে আছে?!

'মেরী মা'র কোন দেবদূত নিশ্চয়ই এসব টুকে নিয়ে হিসেব করে রেখেছে। হঠাৎ একদিন সে বলে উঠবে:

'"দেবমাতা, পাসেকি গ্রামের এই ভাসিল য়াৎসিনা লোকটি জীবনে কী দুঃখকষ্টই না পেয়েছে!" তারপর দেবদূত আরো বলবে, "দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হবার পর য়াৎসিনাকে বাঁধা কাজ দেওয়া হয়, আর দেওয়া হয় দেড় হেক্টার জমি, এমন কি একটা বাড়িও। তাই জীবনের শেষ দিকে বেচারী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পায় ..."

'য়াৎসিনা তখন নিজেই অনুমতি নিয়ে উঠবে।

'সে বলবে, "ভগবানের নাম করে বলছি, জীবন সত্যিই এখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু য়াৎসিনার একটি মেয়ে আছে, তার নাম আন্না। সবাই জানে সৌন্দর্যের অভাবে মেয়েটির বিয়ে

হচ্ছে না। সে অভাব অবশ্য য়াৎসিনার চোখে ধরা পড়ে না, তবে অন্যেরা বলে। হতে পারে হয়ত সত্যিই ওর কোন সৌন্দর্য নেই — সুঁটকো মুখ, চোখদুটো দেখে মনে হয় এইমাত্র বুঝি কেঁদে উঠল, এমনি লাল। অন্যেরা এজাতীয় দুর্ভাগ্যকে চাপা দেওয়ার জন্য যৌতুক দেয়। য়াৎসিনাও তার সারা জীবন এই যৌতুকের কথাই ভেবেছে ...”

‘শেষ পর্যন্ত একটি যোগ্য পাত্র পাওয়া গেছে মনে হল। ইভান শেকেতা। বাড়ি তার চোর্নয়ে গাঁয়ে। বাবা তার য়াৎসিনারই বন্ধু আন্দ্রেই মারা গেছে। ইভান বেশ লম্বা চওড়া শক্তসমর্থ সুদর্শন ছেলে, কিন্তু তারও কোন বাড়ি ঘরদোর নেই। ভগবান যখন কাঠের কলে কিছু অর্ডার পাইয়ে দেন, ইভান শেকেতা তখন কাঠ কাটতে যায়। তা নাহলে পাহাড়ের গায়ে ভেড়া চরায় নয়ত ধনী কর্তা মিকলা ভার্গার বাড়িতে ছুটকো ছাটকা কাজ করে। তবে সব কাজই অন্যের জন্য।

‘বুড়ো শেকেতা বেঁচে থাকতে দুই বন্ধুতে একটি বোঝাপড়া হয়েছিল। ঠিক ছিল য়াৎসিনার মেয়ে যদি যৌতুক হিসেবে ছোট্ট একটুকরো জমি, একটা বাড়ি আর একটা গরু দিতে পারে, তবে ইভান তাকে বিয়ে করবে। ইভান নিজেও তখন তার স্বীকৃতি জানিয়েছিল। হয়ত বাবার মতে অমত করবে না, এই ভেবেই রাজী হয়েছিল, কিম্বা হয়ত অন্যের বাড়িতে থেকে থেকে সে তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমনকি পাখিরাও নিজের বাসায় থাকে।

'যা হোক, য়াৎসিনা তখন যৌতুকের জন্য আবেদন নিবেদন সুরু করল। কী চেষ্টাই না করল, কত সব অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়াল! কিন্তু কিছুই ফল হল না — হাজার চেঁচামেচি কর, মাটির গায়ে আঁচড় কাট কিছুতেই লাভ হবে না! সোভিয়েত সরকার না এলে ভাসিল য়াৎসিনার হয়েছিল আর কি! আন্নাকে তবে সে কী দিয়ে যেত? কিন্তু এখন সে তার যৌতুকের জন্য দেড় হেক্টার জমি আর একখানা বাড়ি পেয়েছে — সোভিয়েত সরকার দিয়েছে। এসবই তো আন্নারই। পাছে মেয়ের যৌতুক ভেস্তে যায়, সেই ভয়েই তো য়াৎসিনা যৌথখামারে যোগ দেয়নি। দেবদূত হয়ত একথাটা জানে না যে, যৌথখামারে যোগ দিতে হলে নিজের জমি দিতে হয়। জমিই যদি রইল না তবে আর মেয়ের বিয়ের যৌতুক দেবে কী করে?..'

এইসব ভাবতে ভাবতেই য়াৎসিনা চলেছে আন্নার ভাড়া করা ঘোড়ার স্লেজে চড়ে প্লেগোভেৎস ছেড়ে তার নিজের গাঁয়ে।

পরিষ্কার হিমেল সকাল। রাস্তাটা ছোট্ট উপত্যকায় পাক খেয়ে ক্রমশ উপরে গেছে। সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা খাড়া পাহাড়গুলো চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে। বনগুলো — গ্রীষ্মকালে তারা দুর্ভেদ্য — এখন বেশ পাৎলা হয়ে গেছে। বনের উপরে, ঠিক আকাশের তলেই পাহাড়ের মাঠগুলোয় বরফের এমন দ্যুতি যে তাকান যায় না, চোখে রীতিমত লাগে।

স্লেজের পাশে চলেছে আন্না। তার চওড়া স্বল্প কুঁজো-কাঁধ

পিঠটা য়াংসিনার চোখে পড়ছে। রানারগুলো ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলেছে, ঘোড়াগুলো ঢিমে তালে পা ফেলে চলেছে। মেয়েটি লম্বা ডাল নিয়ে তাদের ছোটাবার চেষ্টা করছে।

'আন্না,' বুড়ো বলে উঠল, 'এ ঘোড়াদুটো কার?'

'মিকলা ভার্গার,' ফিরে না তাকিয়েই উত্তর দিল আন্না।

'কত টাকা দিলি?'

'আশি, আসা যাওয়া নিয়ে।'

'আশি রুবল,' বুড়ো প্রায় নিঃশব্দেই প্রতিধ্বনি করে উঠল। এত বেশি খরচ করার জন্য তার ক্ষোভ হল ...

খোলা হাওয়ার জন্য নাকি মেয়ে তাকে তার গাঁয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার সে তার নতুন বাড়িটি দেখতে পাবে — এখনো তাতে ভালরকম অভ্যস্ত হয়নি, — একথা মনে হওয়ায় ভাসিলের ব্যথাটা যেন মরে এল। 'ইহজগৎ' আবার বুড়ো য়াংসিনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।

'আন্না!'

'কী, বাবা?' আন্না এবার ঘুরে তাকাল।

মেয়ের মায়া ভরা মুখটা ভাসিলের চোখে পড়ল। মনের মধ্যে ফুটে উঠল মেয়ের প্রতি একটা অপরাধের ভাব। কখনো তাকে একটা মিষ্টি কথা ভাসিল বলেনি, সেই একেবারে বাচ্চা বয়সের পর থেকে; কখনো জিজ্ঞেস করেনি আন্না কী চায়, কী তার ভাবনা। সারা জীবন দুজনের মধ্যে শুধু কাজ প্রতিদিনের রুটি আর শীতকালের গরম জামা নিয়েই কথা হয়েছে। একথা

ভেবেই বুড়োর গা শিউরে উঠল, গায়ের ফার কোট সত্ত্বেও সে কেঁপে উঠল। অথচ এই বিরাট পৃথিবীতে এই মেয়েটিই তার একমাত্র আপনার জন।

'আন্না, চারদিকের সব খবরাখবর আমায় বল। গ্রামে নতুন কী কী ঘটল?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করে ভাসিল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'বলার আর কীই বা আছে?' আন্না অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিল। 'ওরা সব পরিকল্পনা করছে।'

'সে জানি ওরা বনের মধ্যে পরিকল্পনা গড়ছে,' মেয়ের উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে বুড়ো বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'কিন্তু গ্রামের কী খবর?'

'সবখানেই ওরা আজকাল পরিকল্পনা করছে — বনে যৌথখামারে, সবখানে।'

'যৌথখামারে নতুন কী হয়েছে শুনি?' য়াৎসিনার কানদুটো শোনার আগ্রহে খাড়া হয়ে উঠল।

'ওরা বলছে জমি কম, কিন্তু আয় নিচু-জমির খামারের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়।'

'হুঁ, ওরা তবে ঐ চেষ্টা করছে!'

কিন্তু আন্না যেন কথাটা শুনতেই পেল না।

সে বলে চলল, 'ওরা মৌমাছি পালনও সুরু করতে চায়। এর মধ্যেই মৌচাক বানান সুরু করে দিয়েছে।'

'হতেই পারে না, সত্যি নাকি ?' বিস্ময়ে বুড়োর বিষম লেগে গেল।

'লাভ আরো বাড়াবার জন্য বসন্ত এলে ওরা গোরুর কাজও সুরু করবে ...'

'তার মানে? গোরুর কাজ মানে?' য়াংসিনা জিজ্ঞেস করল। 'গোরু ভগবানের সৃষ্টি। কী তুই বাজে বকছিস?'

'বাজে বকছি না বাবা, মিথ্যে কথা কেন বলব বল,' আন্না একটু আহতস্বরেই বলল, 'স্লেগোভেৎস না কিয়েভ থেকে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতরা এসে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন ... কামারের মেয়ে কালিনা সিজাক্ সেদিন আমার কাছে এসেছিল। ওই এখন ডেয়ারীর তত্ত্বাবধানে আছে। সিজাক্ এসে বলল, "আন্না একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও আমাদের ডেয়ারী ফার্মে যোগ দেবার জন্য। তোমায় পড়াশুনোর জন্য পাঠিয়ে দেব। সবকিছু শিখে এসে আমাদের ফার্মেই তুমি কাজ করবে।" পরশুদিন কয়েকজন কমসমল সদস্যও এসেছিল ...'

'ওসব শুনিস না!' আতঙ্কে য়াংসিনা বালিশে দু'হাতের ভর দিয়ে কিছুটা উঠে বসল। 'খবরদার ওসব শুনিস না, বুঝলি? নিজের জমি না থাকলে তোর অবস্থা হবে কাটা ডালের মতো। জমি ছাড়া কে তোকে বিয়ে করবে বল?' বুড়োর তো দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। 'তোর বয়সী অন্য মেয়েরা এতদিনে ছেলের মা হয়ে গেছে। জমি থাকলে স্বামী পুত্র

সবই হবে! ওসব কামারের মেয়ের কথা শ্বনে চলিস না, খবরদার আন্না!'

'তা জানি,' আন্না বলল, 'অত চে'চাচ্ছেন কেন? আমিও ওদের ঐ কথাই বলে দিয়েছি — আমি আসছি না।'

ব্বড়ো শান্ত হল, কিছ্বক্ষণ দ্বজনেই চুপচাপ।

য়াৎসিনা চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল, কেউ শ্বনছে কিনা ওদের কথা, তারপর আবার বলল:

'ইভান তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

আন্নার ম্বখ লাল হয়ে গেল, চোখদ্বটো নামিয়ে নিল। 'আপনি হাসপাতাল যাবার পর একবার মাত্র এসেছিল,' ম্দ্বস্বরে বলল।

'কিছ্ব বলল?' ব্বড়ো উৎস্বক হয়ে উঠল।

'বেশির ভাগ সময় চুপ করেই ছিল। আপনার কথা একবার জিজ্ঞেস করল, তারপর বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। গায়ে সব্বজ ফ্ল্যানেল লাগান নতুন কোট, পায়ে নতুন ব্বট। এখন কাঠুরেদের কারখানায় ঢুকেছে। কেবল ওর দলের কথাই বলে গেল ... আমাদের ছেলেদের সঙ্গে ইভানের ছ্বটির দিনে চোর্নয়েতে দেখা হয়েছিল, ও তাদের খ্বব বীয়রটিয়র খাইয়েছে।'

এ খবর শ্বনে য়াৎসিনা তো হতবাক। 'ও ওদিকে হাসপাতালে পড়ে আছে আর এদিকে ইভান শেকেতার এত উন্নতি! কিন্তু এতে অবাক হবার আর কীবা আছে।

য়াৎসিনার নিজের জীবন, তার ডাইনে বাঁয়ের প্রতিবেশীদের জীবন, বলতে গেলে সারা সাব-কার্পেথিয়ারই জীবন মাঝদরিয়ার স্রোতে পড়া ভেলার মতো বয়ে চলেছে; এত দ্রুতবেগে যে, তার সঙ্গে তাল রাখাই মুশকিল। ইভানেরও সেই একই অবস্থা...'

য়াৎসিনার মনে উৎকণ্ঠা দেখা দিল। 'বুড়ো শেকেতো এখন মাটির তলে। ইভান কি তার কথা রাখবে? যে কাল পড়েছে তাতে ছ'মাসই এখন অনেক সময়। তার উপর ইভানের আগেকার জীবন এখনকার তুলনায় তো কিছুই নয়।'

ভাসিলের উদ্বিগ্ন হৃদয় আশ্বস্ত হতে চাইল।

'তাতে কী এসে যায়, তাতে কী এসে যায়,' বুড়োর রক্তহীন ঠোঁটদুটো ফিসফিস করে বলে চলল, 'নিজের জমি ছাড়া ইভানের কিছুতেই চলবে না!.. নতুন জুতো আর নতুন জামায় মাথাও গোঁজা যায় না, চাষবাসও করা চলে না,' বুড়ো য়াৎসিনা নিজেকে সান্ত্বনা দিল। তবে সান্ত্বনাটা নিজের জন্য ততটা নয় যতটা মেয়ের জন্য।

আন্না মুখ ঘুরিয়ে নীরবে কেঁদে ফেলল। কান্না তার বেশি আসে না, কিন্তু এবার আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সে কি বাবার জন্যই দুঃখিত, নাকি ইভানের প্রতি তার অকৃতার্থ প্রেমের জন্য আহত? বাবা হয়ত না বুঝে শুনেই মনে পড়িয়ে দিয়েছে ইভান তাকে ভালবাসে না, দুজনের বাবা এ বিয়ের ঠিক করেছিলেন বলেই সে রাজী হয়েছিল।

ঘোড়ার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে আন্না তার নিঃসঙ্গতার কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ কেন জানি না, মনে পড়ে গেল গ্রামের লাইব্রেরীতে শীতের সন্ধ্যাবেলায় এক তরুণ শিক্ষকের পড়ে শোনান একটি গল্প।

'কমসমল সদস্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে এই গল্পের আসরে যারা আসতে চায় তাদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল। আন্নার জানলায়ও তারা টোকা মেরেছিল। লাইব্রেরীতে বসে আন্নার প্রথম প্রথম বড় অস্বস্তি লাগছিল। কিন্তু শিক্ষকটি যতই পড়তে লাগলেন, আন্না ততই ছোট্ট খনির সহর ক্রাস্নদনের অল্প বয়সী মেয়েদের কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠল। হাসিখুসি ভয়ভাবনাহীন ঐ মেয়েরা জানে না, কী ভীষণ দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। জার্মানরা সহর দখল করে ফেলল, জীবনের ধারা গেল পাল্টে। বইয়ে যা বলা হয়েছে তা সত্যিই সাংঘাতিক। আন্না অনুভব করেছিল ঐ সব ছেলে মেয়েদের গল্প — তারা কী করে যেন তার অত্যন্ত আপনার হয়ে উঠেছে — মৃত্যুতেই বুঝি শেষ হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সারা জীবন আলোয় ভরে উঠল, ভরে উঠল বন্ধুত্বে আর এক মহান সুখে, যে সুখের সন্ধান আন্না নিজে কখনো পায়নি।

'কিন্তু ঐ ছেলে মেয়েদের কথা হঠাৎ এখন মনে পড়ল কেন?'

আন্নার মন তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সে কেঁদে ফেলল ...

২

প্রায় ভরদ্বপ্নরে বছর পনেরকের একটি ছেলে ঘোড়া ছ্বটিয়ে চলেছে পাহাড়ে কাঠুরেদের ছাউনিগ্বলোর দিকে। ছেলেটিকে দেখে চতুর্থ দলের কাঠুরেরা কাজ থামাল। প্রায় খাড়া ঢাল্বর গায়ে বড় বড় বীচ্ গাছগ্বলোর ইস্পাত রঙের গংড়ির মাঝখানে বরফের উপর দাঁড়িয়ে তারা সবাই ভাবতে লাগল সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে ছ্বটে আসা ছেলেটি কী খবর নিয়ে আসতে পারে।

ছেলেটি ঘোড়া থামিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দ্ব'হাত ম্বখের কাছে তুলে টেনে টেনে চেঁচিয়ে ডাক দিল:

'শে-কে-তা!.. ই-ভান্!'

যাকে ডাকা হল সে লোকটি হচ্ছে রোদে পোড়া গায়ের রঙ, সর্ব্ব বাঁকা ভুর্ব্ব এক কাঠুরে। চোখদ্বটো তার বাদামী, একগোছা ঘামে ভেজা চুল টুপির তল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কুড়্বলটা গাছের গংড়ির উপর বসিয়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আমিই শেকেতা! কী দরকার?'

'ব্বড়ো য়াৎসিনা মরে যাচ্ছে, আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছে।'

শেকেতার ভুর্ব্ব কুঁচকে গেল।

'কী কাণ্ড,' সে ম্বদ্বভাবে বলল।

ইভান শেকেতা ব্বড়ো য়াৎসিনাকে খ্ববই শ্রদ্ধা করত, তাকে

তার বাবার মতোই মনে করত। হঠাৎ তার মনে পড়ল, তাদের একজন পরিশ্রম আর বার্ধক্যে ঝুঁকে পড়েছে, আরেকজন শক্ত সমর্থ সজীব জোয়ান এদিক ওদিক কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখন বুড়ো মরতে বসেছে। অবশ্য ও যে বেশিদিন বাঁচবে না তা ইভানের জানা ছিল -- বহু দিন থেকে লোকে সে-কথা বলছে, কিন্তু তবু শেকেতো গভীর দুঃখ পেল। সেই সঙ্গে দেখা দিল বুড়ো ভাসিলের প্রতি তার অপরাধবোধ, কারণ এই মুমূর্ষু লোকটির কাছে ইভানকে সবকিছু খুলে বলতেই হবে। এই চিন্তায় ইভানের ভ্রূকুটি আরো তীব্র হয়ে উঠল। ছেলেটিকে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে চিৎকার করে ইভান ফোরম্যানের কাছে ছুটি চাইতে চলে গেল।

ছাউনিতে গিয়ে জামাকাপড় বদলে সে পাহাড়ে পথ বেয়ে নেমে এসে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটায় চড়ে বসল। তারপর ছেলেটিকে তার পিছনে টেনে নিয়ে রওনা হল।

পথের প্রথম অংশটা ইভান বুড়োর কথাই ভেবে চলল। ভাবতে লাগল মৃত্যু কি সত্যিই অবধারিত, মানুষকে অমর করে রাখার জন্য কিছু করা যায় নাকি। পথের দ্বিতীয় অংশটায় — চোর্নয়ে থেকে পাসেকি পর্যন্ত — ইভান ভাবতে লাগল সত্যি কথাটা এই মুমূর্ষু লোকটির কাছে কী ভাবে বলবে যাতে বুড়ো তাকে বুঝে, তার উপর রেগে না যায়। কিন্তু সেরকম কোন উপায়ই বের করা গেল না।

পথটা বন ছেড়ে একটা উপত্যকায় গিয়ে পড়ল। তারপর

উঠল টিলার গা বেয়ে। প্যাসেকি গ্রামটা এখন ইভানের চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে।

য়াংসিনার বাড়ির কাছে কেউ ছিল না, চিমনি দিয়ে অলসভাবে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ইভান বুঝল ওর দেরী হয়ে যায়নি, য়াংসিনা বেঁচে আছে।

কাঠের গির্জাটার কাছে এসে ইভান সেই ছেলেটির কাছ থেকে বিদায় নিল। য়াংসিনার বাড়িটা সেখান থেকে কিছুটা দূরে। ইভান হেঁটেই এগোল। তার বিশ্বাস বুড়োর সঙ্গে দেখা করাটা যদি আরো কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়ত সব কিছু আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। মৃত্যুপ্রত্যাশী লোকটির কাছে কিছু বলার আর দরকার হবে না। এই ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্তি দেবার জন্য ইভান তার বনের কাজের কথা ভাবতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হালকা লাগল কিন্তু একটা নতুন আশংকা আবার তাকে জ্বালাতে সুরু করল : য়ারভেৎসের কাঠুরে দল, তার চোর্নয়ের দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়েছে, য়ারভেৎসের দলটা বলে দিয়েছে তারা এত দূরে এগোবে যে তাদের হাত নেড়ে বিদায় জানান ছাড়া চোর্নয়ের দলের কাঠুরেদের আর কিছু করার থাকবে না। তবে এ আশংকাটা বেশ মনোরম। ইভান ভাবল এ না থাকলে জীবনটা বিফল বিস্বাদ হয়ে যেত। এই সব ভাবতে ভাবতেই ইভান গিয়ে পেঁছিল য়াংসিনার বাড়িতে।

স্বল্পালোকিত প্রবেশপথে আন্নার সঙ্গে দেখা হল। কেউ কারো দিকে না চেয়ে নমস্কার করল। আন্না তাকে

ঘরে নিয়ে গেল, কিন্তু নিজে ঢুকল না, প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরটা বেশ গরম। গুমোটে দমবন্ধ হয়ে আসে। তার উপর আবার ওষুধের গন্ধ। ভেড়ার চামড়ার কোটে ঢাকা বুড়ো য়াংসিনা একটা উঁচু কাঠের খাটে শুয়ে আছে। মাথা পিছনে হেলান। বোঝা যাচ্ছে না কী করছে, ঘুমচ্ছে না সিলিং'এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ইভানের পায়ের চাপে কাঠের মেঝে আওয়াজ করে উঠল, য়াংসিনা কিন্তু তবু একটুও নড়ল না।

ইভান বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল, কী করবে বুঝতে পারল না। এমন সময় বুড়ো নড়ে উঠে সিলিং থেকে ইভানের দিকে চোখদুটোকে নামাল। নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ চোখ, কোন অভিব্যক্তির ছাপ নেই।

'ইভান নাকি?' য়াংসিনা চাপা গলায় বলল।

'হ্যাঁ, আমি ইভান,' য়াংসিনার উপর ঝুঁকে পড়ে ইভান বলল, 'আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলন, আমি এসেছি।'

'ঠিক, তোমায় ডেকেই পাঠিয়েছিলাম,' য়াংসিনা যেন মনে করতে চাইছে কেন সে ইভানকে ডেকে পাঠিয়েছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখদুটো যেন একটু জ্বলে উঠল, কোটের তলে নড়ে চড়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সে কিছুটা উঠে এল।

'আমি মরতে বসেছি ইভান, দেখতেই তো পাচ্ছ,' বিস্ময়ের সুরে সে বলে উঠল, 'কী কিছু বলছ না যে?'

এসময়ে সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে ইভান ভাবছিল

সেরকমই একটা কিছু বলবে, 'না, না, কেন আপনি ওরকম বলছেন! আপনি ভাল হয়ে যাবেন, আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবেন!' কিন্তু এরকম মিথ্যা কথা তার মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে ধরা টুপিটায় গোঁজা ফারের ডালের কাঁটাগুলো ভাঙতে লাগল।

'তাতে কিছু না,' য়াংসিনা বলল, 'বুড়োরা মরবে, জোয়ানরা বেঁচে থাকবে, এ তো হতেই হবে ...'

তারপর হঠাৎ নিজের কাজের কথা মনে করে শক্তি সঞ্চয় করে বহু চেষ্টায় একপাশে হেলে য়াংসিনা বালিশের নিচে হাতড়ে একটা কাপড়ের মোড়ক বের করল। হন্তদন্ত হয়ে সেটাকে খুলতে আরম্ভ করল, যেন পাছে দেরী হয়ে যায় এই ভয়। মোড়কটার ভিতরে কিছু টাকা ছিল।

'এই যে ইভান, গোরু বা ঘোড়া যাই কেন তার টাকা,' দ্রুত ফিসফিস করে বলে একহাতে বুড়ো টাকাটা বাড়িয়ে দিল, দুর্বল হাতটা তার তখন থর থর করে কাঁপছে। 'গাড়ি কেনার জন্য হয়ত যথেষ্ট হবে না। সেটা তুমি নিজেই কোনরকমে করে নিও... এর বেশি আর আমি কিছুই করতে পারলাম না... অত্যন্ত দুঃখিত ...'

ইভান তখন ঘেমে উঠেছে, ঠোঁটদুটো তার অবশ হয়ে গেছে। এক মিনিট আগেই একটা মিথ্যা কথা বুড়োকে সে কিছুতেই বলতে পারেনি, এখন সত্যি কথাটাও বলতে সাহস পেল না।

টেবিলের উপর টুপিটা রেখে ইভান সযত্নে য়াংসিনার হাত

থেকে টাকাটা নিয়ে দুবার গুণল। তারপর টাকাটা ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে একটা সেফ্‌টিপিন আটকে দিল।

বুড়ো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ভীষণ ক্লান্তিতে বালিশের উপর পড়ল ঢলে।

ইভানের মন তখন গভীর দুঃখে ভরে উঠেছে। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে আছে শেষ আশীর্বাদ বা শেষ উপদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেরকম কিছুই বুড়ো বলল না।

হঠাৎ য়াংসিনা বলে উঠল, 'যাও ইভান, আমি একটু ঘুমব। আন্নাকেও বলে দিও, আমি একটু ঘুমব।'

য়াংসিনা সত্যি সত্যি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। নিঃশ্বাস পড়তে লাগল সশব্দে ঠেকে ঠেকে।

ইভান পা টিপে টিপে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রবেশপথে আন্না তার জন্য দাঁড়িয়েছিল। সে তাকে একটিও প্রশ্ন করল না, ইভানও তাকে কিছুই বলল না। ইভানের ইচ্ছা তক্ষুণি চলে যায়, কিন্তু তা সে পারল না। রোদজল খাওয়া তামাটে চামড়ার তলে তার গালের মাংসপেশীগুলো তখন নড়ছে। জগৎশুদ্ধ সবার উপর তখন সে ক্ষেপে গেছে। বুড়োকে যে কথা সে বলতে পারেনি সে কথা আন্নাকেই বলত আর একটু হলে, কিন্তু আন্নার চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত হয়ে গেল। আন্নার চোখদুটি তার কাছে কী যেন চাইছে। ইভানের রাগ যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেল।

'আন্না,' টুপিটা ভুরু অবধি টেনে দিয়ে ইভান বলল, 'যদি কিছু হয়, মাকভিৎস কাঠুরে-ছাউনিতে খবর দিও, ওদের চার নম্বর দলে আমি কাজ করছি।'

পিছনের উঠোন পর্যন্ত আন্না ইভানকে এগিয়ে দিল। বনে যাবার পথে পড়তে হলে ওখান দিয়ে কম হাঁটতে হয়। কঞ্চির উঁচু বেড়াটা একলাফে ইভান পার হয়ে গেল, নতুন সাদা জ্যাকেটটা একবার খোলা হাওয়ায় কেবল ঝাপটা মারল। হয় খোলা জায়গায় আসার জন্যই নয় তো লাফটার ফলে একটু উৎসাহিত বোধ করায় ইভান হঠাৎ হেসে ঘুরে দাঁড়িয়ে আন্নার দিকে তাকিয়ে আদরের সুরে বলল:

'আন্না, বেশি মুষড়ে পড় না ... এর উপর আর কার হাত আছে বল ...'

এর দুদিন পর ভাসিল য়াংসিনা মারা গেল। আন্না তার বাপের মৃত্যুকে শান্তভাবেই মেনে নিল। একফোঁটাও চোখের জল নয়, চিৎকার নয় দেখে সবাই অবাক। কেবল মুখটা তার আরো লম্বাটে হয়ে গেল, আরো ছুঁচলো।

আন্না সবকিছুই করল নিজে। ছুতোরের সঙ্গে কফিনের দাম নিয়ে দরকষাকষি, তারপর নিজে হাতে বুড়োকে নাওয়ান, পোষাক পরানো, সবই। তার কারণ অন্যের কাছ থেকে জীবনে কখনো সে কোন সাহায্য পায়নি। সে কয়দিন আন্না বাইরে যাই করুক মনে মনে কিন্তু সে তার বাবার কথা মোটেই ভাবছিল না, ভাবছিল ইভানের কথা। প্রথমে মনে হয়েছিল

এতে পাপ হবে, তাই ইভানের চিন্তাকে সে মন থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চিন্তা আবার কখন আপনা থেকেই চুপি চুপি এসে তার মন জুড়ে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত সে তাতে গা ভাসিয়ে দিল। মনে মনে আশা রইল হয়ত তার এই পাপ ক্ষমা করা হবে।

অন্ত্যেষ্টির পরে ইভান আন্নাকে বলল পরের শনিবারে সে দেখা করতে আসবে।

সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরেই আন্না শনিবারের জন্য প্রস্তুত হতে লেগে গেল। দেয়ালগুলো চুণকাম করল, চুল্লীতে আগুন ধরাল, যেন ইভান এক সপ্তাহ পরে নয়, আজই এসে পড়বে।

কামারের মেয়ে কালিনা সিজাক — বুকদুটি তার নিটোল ভরাট, চুলগুলো লালচে — এসে আন্নাকে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার হয়ত একা থাকতে ভয় করে। ওকথা বলতে কোন ইতস্তত কর না। আমরা কমসমলের মেয়েদের বলে দেব, তোমার সঙ্গে প্রথম কয়েকটা রাত্তির তারা কাটিয়ে যাবে। নয়তো আমি নিজেই আসব।'

তার প্রতি এই দরদ আন্নার মনকে নাড়া দিয়েছে; অন্য সময় হলে সে সানন্দে কালিনাকে তার সঙ্গে থেকে যেতে বলত কিন্তু এখন সে মাথা নেড়ে বলল:

'না, তার কোন দরকার নেই। আমি ভয় পাই না ...'

ইভানকে নিয়ে তার ভাবনা ক্রমশ দুঃসাহসী হয়ে উঠল। এর মধ্যেই সে তাদের যুগ্মজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি খুঁটিয়ে

দেখতে স্বর্ করেছে। দরজার পাশে এই পেরেকে ইভান তার নতুন জ্যাকেট ঝুলিয়ে রাখবে, ঐ জানলা দিয়ে আন্না দেখবে ইভান কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছে, এই টেবিলে বসে দুজনে মিলে রাতের খাওয়া খাবে ...

উঠোনে বেরিয়ে এসে আন্না দেখল গেটের একটা তক্তা আলগা হয়ে ঝুলে রয়েছে। অভ্যাসবশে সে প্রবেশপথের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, একটা হাতুড়ি আর পেরেক এনে গেটটা ঠিক করবার জন্য। কিন্তু একটা কথা মনে হওয়ায় সে থেমে গেল, 'ইভানের জন্য রেখেছি ওটা।' এমনকি ইভান তক্তাটার গায়ে পেরেক মারছে, এই ছবিটা আরো স্পষ্ট করে দেখার জন্য সে চোখদুটোও বুজে ফেলল।

অলসতার অভ্যাস আন্নার নেই। কিন্তু এখন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চিতে বসে কেবল ঐ কথাই ভাবতে থাকে — কঞ্চির বেড়ার কাছে ইভান তাকে কেমন করে বলেছিল, 'বেশি মুষড়ে পড় না।' আর কেউ কখনো তার সঙ্গে এমন স্নেহের কথা বলেনি, এমনকি বাবাও না ...

৩

পুরো সপ্তাহটা কাঠুরেদের পাহাড়েই কাটে। রাত্তিরে ঘুময় ছাউনিতে, কেবল রবিবার দেখা করতে আসে বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে। আসামাত্রই গ্রামে হৈহল্লা পড়ে যায়।

কাঠুরেদের কারখানার লরীগুলো সাধারণত শনিবার দিন সন্ধ্যায় সবাইকে পেঁছে দিয়ে যেত আবার সোমবার ভোরবেলা তাদের নিয়ে যেত। কিন্তু ইভানের যে শনিবারে আসার কথা সেদিন কোন লরী এসে পার্সোকিতে পেঁছিল না। পরদিন সকালেও না, দুপুরের খাবারের সময়েও না। শেষকালে আকাশে প্রথম তারা ফোটার সময় তারা গ্রামে এসে পেঁছিল।

আন্না শুনতে পেল একটা লরী এসে তার বাড়ির দরজায় থামল। জানলার নিচে বরফ ভাঙার শব্দ শোনা গেল। ধড়াস করে দরজার আওয়াজ। ঘরে ঢুকল ইভান।

আন্না এতদিন ইভানের অপেক্ষাতেই বসে ছিল। কিন্তু সেই প্রতীক্ষা ফুরতে সে এমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল যে আলো জ্বালাবার জন্য দেশলাই কাঠিটাও ধরে রাখতে পারল না।

'আমি জ্বালাচ্ছি,' ইভান অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে নিজেই আলোটা জ্বালাল। ঘরের ভিতর হিম আর বনের এক সুন্দর গন্ধ ইভান বয়ে নিয়ে এসেছে।

পলতেটা ভালভাবে ধরতে গোধূলির অন্ধকার ঘরের কোণে সরে গেল। ইভান বেঞ্চিতে বসে পড়ে তার পাইপটা ধরিয়ে নিল। আন্না তখনো টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ইভানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

'ইভান, তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে,' আন্নার মুখে শেষপর্যন্ত কথা ফুটল, 'দাঁড়াও, তোমার খাবার আনছি।'

'কিছু প্রয়োজন নেই,' ইভান বলল, 'আমার খিদে পায়নি।'

একটু থেমে আবার বলল, 'কাল রাত থেকেই আসার চেষ্টা করছি, কিন্তু আটকা পড়ে গেলাম... য়ারভেৎসের লোকগুলো আমাদের হারিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, এমনকি এগিয়েও গিয়েছিল। তার কারণ আমরা আমাদের কাজটাকে অত্যন্ত সহজভাবে নিয়েছিলাম। পার্টির মুখ্য সম্পাদকও সেই কথাই বলল, আমরা খুবই গা ছেড়ে দিয়ে কাজ করছি। "তোমরা কেবল নজর রাখছ তোমাদের উৎপাদ যাতে কমে না যায়, উৎপাদ বাড়ানর দিকে তোমাদের নজর নেই," পার্টি সম্পাদক বলল। ঠিকই বলেছে। এই তো হয়,' ইভান দুঃখের সঙ্গে বলল, 'ভালো সবসময় ভালো থাকে না!'

'কিচ্ছু ভেব না,' ইভান উৎসাহে জ্বলে উঠল, 'পরের বার ওদের দেখিয়ে দেব। ভগবানের নাম করে প্রতিজ্ঞা করছি, সারা বনটাকে নাচিয়ে ছাড়ব!'

'আন্না জান, আমাদের দলগুলো ঠিকভাবে সংগঠিত নয়,' ইভান বলে চলল, 'আমার কথাই ধর না: গাছ কেটে ডালপালা ছেঁটে তাকে চালানের ওখানে নিয়ে যাওয়া, সব আমায় একা করতে হয়। এতে কত সময় যায় তা একবার ভেবে দেখ!'

ইভান তার উত্তেজনায় আত্মহারা, আন্নার মনেও সেই উত্তেজনার ছোঁয়া লাগল।

'সবাইকে ঠিক জায়গা মতো বসাতে হবে,' ইভান বলল, 'একদল গাছ কাটবে, আরেকদল ডালপালা ছাঁটবে, তৃতীয় দল গাছগুলোকে চালনের জায়গায় নিয়ে যাবে...'

'তাছাড়া আমাদের মাথায় আরেকটা বুদ্ধিও এসেছে,' অনেকক্ষণ থেমে থেমে কথাটা ইভান এমনভাবে বলল যেন কী একটা গোপন কথা বলছে। বোঝা গেল খুব একটা বড় কথা সে আন্নাকে বলার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। 'আমরা চাই ভেরখভিনার সব কাঠুরেদের চিঠি পাঠাব। সে চিঠিতে আমাদের প্রতিজ্ঞা জানান থাকবে — নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদের পরিমাণ।' ইভান চুপ করে গিয়ে জোর জোর পাইপ টানতে লাগল। 'একথা কাউকে বল না কিন্তু। এ নিয়ে এখনো কথা বলার সময় হয়নি, চিঠির খসড়াটা এখন শুধু ভাবছি।'

ইভান চোখ তুলে তাকাল। তারপর হঠাৎ আন্নাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন এই প্রথম মনে পড়ে গেল সে তো এসব কথা বলার জন্য এখানে আসেনি, এসেছে সম্পূর্ণ অন্য কাজে। সেটা মনে পড়তেই তার আগ্রহ গেল নিভে।

ইভানের হঠাৎ ভ্রূকুটি আন্নার চোখে পড়ল। একটা অমঙ্গলের আশংকা তার বুকে চেপে বসল।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন আন্না,' মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই ইভান বলল, 'বস...'

আন্না ধীরে ধীরে বেঞ্চির উপর বসে পড়ল।

'আমার উপর রাগ কর না আন্না,' ইভান আদরের সুরে বলল, 'তোমার কাছে আমি মিথ্যে কথা বলতে চাই না ... তোমার প্রতি আমার কোন ভালবাসা নেই, কোনকালে ছিলও না... বাবা সে কথা ভেবে দেখেননি। সবাই যা করে তিনিও

তাই করেছিলেন। একটা বাড়ি পেলেই তো হল! আমি কিন্তু কিছুতেই তা করতে পারি না। আমি কেন আমার জীবনটা নষ্ট করব? আমায় তুমি খারাপ ভেব না আন্না। আমি চাই না তুমি অসুখী হও — আমিও ... ব্যাপারটা হল এই...'

ইভান থামল।

কিছুক্ষণ পর পকেটের সেফ্‌টিপিন খুলে য়াংসিনার দেওয়া টাকাটা টেবিলের উপর রেখে দিল।

'পুরো টাকাটাই এখানে রয়েছে। মৃত্যুশয্যায় তাঁকে আর দুর্ভাবনায় ফেলতে চাইনি, তাই টাকাটা তখন নিয়েছিলাম। তাঁকে তখন সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। তুমি হয়ত ভাবছ সত্যি কথাটা এখন বলা আমার পক্ষে খুব সোজা, তাই না?'

আন্নার সারা শরীর তখন অসাড় হয়ে গেছে। দুঃখ বা ব্যথা কিছুই সে বুঝতে পারছে না। নিজের প্রতি করুণা, ইভানের প্রতি ঘৃণা, তাও নয়। তার তখন একটিমাত্র ভয়: সবকিছু আজ ভেঙে পড়ে গেল, তার এতদিনের স্বপ্ন আর আশা কে যেন কাস্তে দিয়ে মুড়িয়ে কেটে দিল — সেটা একসঙ্গে উপলব্ধি করা।

'তুমি কি আর কাউকে খুঁজেছ?' আন্নার গলা কেঁপে উঠল।

'না এখনো কাউকে খুঁজিনি,' ইভান উঠে পড়ে বলল, 'একদিন সে নিজেই আসবে ... তোমারো তাই হবে।'

আন্না চুপ। কাঁধদুটো তার ঝুলে পড়েছে, অশ্রুরিক্ত চোখদুটো একটি লক্ষ্যে সোজা তাকিয়ে আছে: আলোর হলদে শিখাটার দিকে। ইভানের চলে যাওয়ার শব্দও তার কানে এল না।

## ৪

তিনদিন আন্না বাড়ির বার হল না। একা একা বসে রইল, না রইল কোন ভাবনা, না রইল কোন বাসনা। তৃতীয় দিনের শেষাশেষি এই নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠল। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে ঘরের ভিতরেই পায়চারি সুরু করে দিল। সন্ধ্যার দিকে কাঁধের উপর একটা কালো শাল ফেলে সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের লম্বা রাস্তাটা দিয়ে ধীরে ধীরে পাদুটোকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

বেশ ঠান্ডা। গ্রাম এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুক্লপক্ষের নতুন চাঁদ সাদায় মোড়া পাহাড়ের অনেক উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। তার আলোয় উজ্জ্বল বরফের চূর্ণ। গাছগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে, হিমে জমে গেছে। পাৎলা ডালগুলো যেন কালো পেটওয়ালা সাদা শুঁয়োপোকা।

গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে পড়ল আন্না, পথে কারো সঙ্গে দেখা হল না। চারিদিক জনশূন্য নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল শোনা যাচ্ছে বরফমুক্ত পাহাড়ে নদীর ক্ষীণ কলধ্বনি,

মনে হচ্ছে হাতে রূপোর পয়সা নিয়ে কে যেন ঝন্ ঝন্ করে বাজিয়ে চলেছে।

যে নিঃসঙ্গতা আন্নাকে বাড়ির বাইরে এনেছিল, সেই নিঃসঙ্গতাই তাকে আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনল। তুষারকণায় মোড়া ঘুমন্ত গুটিসুটিমারা বাড়িগুলো পেরিয়ে সে হেঁটে চলল। কোন কোন বাড়ির জানলায় তখনো আলো দেখা যাচ্ছে। আন্নার প্রচণ্ড ইচ্ছা হল কোনো জানলায় টোকা মারে। কিন্তু তারপর কী বলবে, এত রাত্তিরে আসার একটা কারণ তো দিতে হবে। নিজের বাড়ির যত কাছে এসে পড়ে, নিঃসঙ্গতা ততই অসহ্য হয়ে ওঠে। একটা ভীষণ বোঝার মতো সে নিঃসঙ্গতা যেন তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইছে, অথচ আন্না চাইছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দম নিতে। কেন করছে তা বোঝার আগেই আন্না কামারের খোদাই করা ছোট্ট কাঠের বারান্দা আর খড়ের চালওয়ালা বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল। জানলাগুলো অন্ধকার। মিকলা সিজাক আর তার লালচুল মেয়ে কালিনা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঠের ছোট্ট সাঁকোটা পার হয়ে আন্না সামনের বারান্দায় ছুটে গিয়ে টোকা মারল।

ছোট্ট বরফজমা জানলাটায় চমকে উঠল আলো, দরজার আড়ালে শোনা গেল পায়ের শব্দ।

'কে?'

'আমি।'

দরজা খুলে গেল। রাত্রিবাস পরে কালিনা বেরিয়ে এল, চোখদুটো তার ঘুমে ভরা, হাতে একটা আলো।

‘আন্না তুমি? কিছু হয়নি তো?’

‘না, না, কিচ্ছু না।’ আন্না হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘একা থাকতে কী রকম ভয় করতে লাগল।’

... খাটের উপর পা তুলে বসল কালিনা, হাঁটুর উপর চিবুকের ভর দিয়ে। তারপর প্রেমের গল্প শোনায় মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ সুপ্রকট কৌতূহল নিয়ে সে শুনতে লাগল আন্নার কথা। কিন্তু আন্নার প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে তার কৌতূহল কমে আসতে লাগল। কালিনার গাব্‌লাগোব্‌লা টোল পড়া হাসিখুসি মুখটা ক্রমেই বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বিছানার পিছন থেকে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট টেনে নিয়ে কাঁধের উপর চড়িয়ে দিল।

ইভানের সঙ্গে তার ব্যাপারটার সমস্ত কথা যখন আন্না কিছুটা ইতস্ততের পর কালিনাকে জানাবে বলে ঠিক করে, তখন তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কালিনা নিশ্চয়ই তার হয়ে ইভানের নিন্দে করবে।

কালিনা কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চুপ করে রইল। তারপর বলল:

‘কী বলব আন্না, তা তো জানি না। যদি বলি কাণ্ডটা যতটা ভাবছ ততটা খারাপ নয় তবে নিশ্চয় তুমি বিশ্বাস করবে

না... কিন্তু ইভানকেও তো দোষ দেওয়া চলে না। সে ঠিকই করেছে। যাকে সে ভালবাসে না তাকে বিয়ে করে কেন জীবনটা নষ্ট করবে? আগেকার দিনে বাবারা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিত, হয়তো বা অভাবে পড়ে — কিন্তু সে দিন চলে গেছে। তুমি নিজেই বল না...'

আন্নার হৃৎস্পন্দন পর্যন্ত থেমে গেল। বন্ধুর কাছ থেকে এমন কথা শুনবে ভাবতেও পারেনি। কালিনা আর ইভান — দুজনেরই মুখে এক কথা শুনে আন্না বিস্মিত হয়ে গেল, যেন ওরা দুজনেই এমন কিছু জানে যা তার অজ্ঞাত।

'আমি তবে কী করব?' আন্না অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'তার কথা আর ভেবো না... আর তুমি... তোমায় এখন অন্যভাবে বাঁচতে হবে, পুরনো জীবনযাত্রা বদলাতে হবে!' কালিনার মুখে আবার সেই স্বাভাবিক দুষ্টুমির ভাব ফুটে উঠল। 'আন্না, তুমি আমাদের ডেয়ারীতে যোগ দাও। দেখবে তোমায় কোন আফশোস করতে হবে না, জীবন একেবারে বদলে যাবে। সত্যি বলছি।'

'খালি ঐ যৌথখামার আর ডেয়ারীর কথা!' আন্না মনে মনে চটে উঠল। 'পুরো পাঁচটি বছর আমিও কাউণ্টের ওখানে গোরুর তদারক করেছি। সেটাও কাজ, এটাও তাই, কোন তফাৎ নেই।'

'জান, আরো উত্তরে, কস্ত্রোমার কাছে,' কালিনা বলে চলল, 'কোন কোন গোরু দিনে ষাট লিটারেরও বেশি দুধ দিচ্ছে!'

'ও সব বাজে বড়ফট্টাই!' আন্না বলল।

'বড়ফট্টাই?' কালিনা জ্বলে উঠল। 'যে মেয়েরা ঐ গোরুদের ভার নিয়েছে তাদের ফোটো পর্যন্ত আমার কাছে আছে, বড়ফট্টাই বললেই হল!'

বিছানা থেকে সড়াৎ করে নেমে কালিনা একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স খুলে বের করল রুমালে মোড়া একগাদা ফোটো, নববর্ষের পোস্টকার্ড — তাতে চকচকে রঙ লাগান দেবদূত, পত্রিকা থেকে নেওয়া ছবির পাতা — ধারগুলো ক্ষয়ে গেছে। পত্রিকার ছবির পাতাটা কালিনা সযত্নে টেবিলের উপর মেলে দিল।

সাদা ওভার-অল পরা হাসিমুখ মেয়েরা আন্নার দিকে তাকিয়ে রইল। আরেকটা ছবিতে দেখা গেল কতগুলো ঘাড়ে গর্দানে মোটা গোরু। বহুদূরের অজানা সহর কস্ত্রোমার কাছে কোথায় যেন ছবিগুলো তোলা হয়েছে। ছবির নিচের লেখাগুলো কালিনা পড়তে সুরু করল।

'বেশ পড়তে পারে তো,' আন্না মনে মনে ভাবল, একেবারে যে ঈর্ষাশূন্য ভাবেই তা বলা যায় না। কিন্তু একথা সে আঁচ করতে পারল না যে, কালিনা বহুদিন আগেই প্রত্যেকটি লাইন মুখস্থ করে ফেলেছে।

আন্না টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। কস্ত্রোমার ডেয়ারীর মেয়েরা কীভাবে চ্যাম্পিয়ন গোরু মিনুৎকা, সুন্দরী আর চেরীর যত্নআত্যি দেখাশোনা করে তাই শুনতে লাগল।

'আমরাও এরকম গোরু পেতে পারি, তাই না?' কালিনা বলল, 'আমাদের হয়ত যথেষ্ট ধৈর্য নেই? সাহায্য পাব না? তুমি আর আমি ওই কস্ত্রোমায় গিয়ে ওদের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে আসব...' আন্নাকে সে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল। 'আন্না! একবার ভেবে দেখ — প্রত্যেকটি যৌথখামারে একটা করে ডেয়ারী আর প্রত্যেকটা ডেয়ারীতে মিনুৎকার মতো একটি করে গোরু। আমাদের মাঠে মাঠে এরকম কত সুন্দরী চরে বেড়াবে। "কার গোরু?" ভালমানুষেরা সবাই জিজ্ঞেস করবে। তার উত্তরে শুনবে, "পাসেকির গোরু, ওদের নিজেদের ডেয়ারীর গোরু।"

এক মুহূর্তের জন্য আন্না কালিনার কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হল কালিনা কেন, সে নিজেও দেখতে পাচ্ছে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝখানে চরে বেড়াচ্ছে বড় বড় মোটাসোটা গোরু, আর সবাই জিজ্ঞেস করছে, 'কাদের গোরু?' কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার জমিটার কথা, তার সুখের নিশ্চয়তার জন্য বাবা যা বহুকষ্ট সহ্য করে লাভ করেছিলেন। সে জমি দিয়ে দেবে? কখনোই না! জমি বাদ দিয়ে আন্না দাঁড়াবে কোথায়? তার তো তাহলে কাটা ডালের হাল হবে। আর ইভান যদি মত বদলায়, তখন? তখন সে তাকে কী দেবে? কে তাকে তখন সাহায্য করবে? না না, সে হবে না, জমি আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে, জমি সে কাউকে দেবে না, কখনো না, কিছুতেই না!

কালিনার কথায় প্রায় ভজে গিয়েছিল, একথা ভেবেই আন্না দারুণ ভয়ে শিউরে উঠল ।

'সব মিথ্যে কথা!' আন্না হঠাৎ বলে উঠল, 'সব বাজে কথা!' গলা চড়িয়ে ক্ষেপে গিয়ে ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এর সবটাই বানান! ওরকম কোন সহরই নেই!'

তারপর বিদায় না জানিয়েই বেরিয়ে গেল।

৫

স্নেগোভেৎসের হাটের দিনে আন্না একটা গোরু কিনল। গলায় দড়ি বাঁধা খয়েরী রঙের রোগা গোরুটা তার কর্ত্রীর পিছন পিছন চলতে লাগল পাসেকির রাস্তা ধরে। সন্ধ্যার আগেই বাড়িতে পেঁাছবে এই ছিল আন্নার ইচ্ছা। কিন্তু মত বদলে রাত্তিরটা সেটল্‌মেণ্টেই কাটিয়ে গেল। তারপর গোরু নিয়ে হেঁটে গ্রামে যখন নিজের বাড়ির উঠোনে পেঁাছল তখন দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে। লোকে তো তার গোরু দেখে অবাক, এমন কি গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি পর্যন্ত বারান্দায় বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল:

'দেখ কী বোকা মেয়ে, হেমন্তে আবার কেউ গোরু কেনে!'

আন্না কিন্তু সেকথা কানেও তুলল না। তার তখন মহাগর্ব — নিজের গোরু হয়েছে, সবাই দেখছে গোরুটা কেমন দর্প ভরে শিং নাড়তে নাড়তে কর্ত্রীর পিছন পিছন আসছে।

এর পর আন্না মিকলা ভার্গার ওখান থেকে একটা পুরনো গাড়ি আর সেই গাড়ি ভর্তি ঘাস নিয়ে এল। সবটা টাকা তার হাতে ছিল না, তাই ভার্গাকে বলে এল বসন্তে ভার্গার ওখানে কাজ করে সে বাকি টাকাটা শুধে দেবে।

সেই ঘাস ভর্তি গাড়িও আন্না ভরদুপুরে গ্রামের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এল। সবাই আবার হাঁ করে চেয়ে রইল তার গাড়ি আর ঘাসের বোঝার দিকে। ঘাসগুলো নামিয়ে গুছিয়ে আন্না গাড়ি সারানর কাজে লেগে গেল। নতুন কাঠের দন্ড কেটেকুটে তৈরী করল, কাঠের ফালি সমান করল। উঠোনে সারাদিন তার কুড়ুলের ঠুকঠাক খটখট সবাই শুনতে পেল। আন্না কাজ করে আর থেকে থেকেই ছুটে গিয়ে গোয়াল ঘরে গোরুটাকে দেখে আসে। গোরুটা মোটেই কিছু সুন্দর দেখতে নয়, কিন্তু তা নিয়ে আন্নার দুর্ভাবনা নেই। তার ধারণা, কালিনা যে জগতে তাকে টেনে নিতে চেয়েছিল তার আর নিজের মধ্যে এক দুস্তর বাধার সৃষ্টি সে করেছে। এ বাধা পেরন যায় না! আন্না তাই ভেবে ভারি খুসী। কালিনার সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হত না, কামারের মেয়েটা এবার বলে কী?

কিন্তু দেখা হওয়াতে দেখল কালিনা আগের মতোই বন্ধুভাবাপন্ন। তার কথায় বা চেহারায় কোথাও আন্নার কাজের নিন্দেও দেখা গেল না, সমর্থনও না। এমনকি ডেয়ারীর বিষয়েও সে কিছুই বলল না। যদিও আন্না শুনেছে, দূরে

উত্তরে অবস্থিত কস্ত্রোমার কাছের সেই খামার থেকে কালিনা তার চিঠির জবাব পেয়েছে।

কিন্তু ঘরকন্না আর সাংসারিক ঝামেলাতেও আন্নার সেই নিঃসঙ্গতা আর বিষণ্ণতা দূর হল না। তার জীবনের তো আর কোনই বদল হয়নি। আগের মতোই এখনো তার জীবন সমান নিঃসঙ্গ, সমান নিরানন্দ। আগে যদি জীবনটা একঘেয়ে লাগত, এখন তা আরো ক্লেশকর হয়ে উঠেছে ...

ইভানকে পাসেকিতে আর দেখা গেল না। তার স্মৃতিও আন্নার মনে আর তেমন ভীষণ আর তীব্র করে বাজল না। কিন্তু আন্না তাকে একেবারে ভুলতে পারল না, ভুলতে চাইলও না।

শনিবার রাত্তিরে কাঠের কারখানার লরীগুলো তার জানলার পাশ দিয়ে চলে যায়। আন্না এখনো অপেক্ষা করে থাকে, হয়ত কোন একদিন কোন একটা লরী এসে থামবে তার বাড়ির দোরগোড়ায়। লরীগুলো প্রতিবারই তার বাড়ি পার হয়ে চলে যায়, থামে না। গ্রাম সোভিয়েতের ময়দানে তাদের ইঞ্জিনের শব্দ সে অনেক পর শুনতে পায়। শুনতে পায় ঘরমুখো কাঠুরেরা নিজেদের মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে চলেছে।

এমনকি ব্যর্থ প্রতীক্ষার এই মুহূর্তগুলোও আন্নার কাছে দুর্মূল্য মনে হতে লাগল ...

৬

জানুয়ারীর গোড়ার দিকেই মাকভিৎস পাহাড়ের পাঁচটা গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ল — স্থানীয় কাঠুরেরা ভেরখভিনার অন্য সব কাঠুরেদের চ্যালেঞ্জ জানাবে। পরের রবিবার তারা সবাই মিলে একটা চিঠি লিখবে অন্যদের কাছে।

খবরটা পাসেকি গ্রাম সোভিয়েতে এসে পৌঁছল। স্থানীয় প্রচারকরা: কালিনা সিজাক প্রভৃতি কমসমল সদস্য আর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী দুজন তাদের নিজের নিজের পাঁচঘরী প্রচার অঞ্চলে খবরটা ছড়িয়ে দিল।

গ্রামের খবরদার য়ুরকো পেতেলিৎস্য আশি বছরের বুড়ো হলে কী হবে, এখনো বেশ শক্তসমর্থ! আগে সে ছিল কাঠুরে। এখন তার তিন ছেলে বনে কাজ করে। নাতির মুখে খবরটা শুনে বুড়ো গ্রাম সোভিয়েতে গিয়ে দুহাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল:

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাকে কমরেড সভাপতি! যখন কোন ক্ষতির খবর ঘোষণা করতে হয়, কিম্বা কোন সভার বা সিনেমার তখন য়ুরকো পেতেলিৎসার ডাক পড়ে। কিন্তু এরকম একটা খবরের বেলায় য়ুরকো পেতেলিৎসাকে বাদ দেওয়া হয়। বেশ বাবা, আপনায় অসংখ্য ধন্যবাদ! এখন থেকে ভাই, আপনি নিজের হাতেই ঢ্যাঁড়া পেটাবেন এই নিন ঢ্যাঁড়া!..'

রাগের চোটে লাল হয়ে সে ঘাড় থেকে পুরনো ঢ্যাঁড়ার স্ট্র্যাপটা খুলতে লেগে গেল।

বুড়োর হাঙ্গামার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সোভিয়েতের সভাপতি পেতেলিৎসাকে তাড়াতাড়ি গ্রামের মধ্যে এই খবর পেঁছে দিতে বলল যে, রবিবার চোর্নয়ে কাঠুরেদের কারখানার দপ্তরে চ্যালেঞ্জের চিঠিটা লেখা হবে, সভায় যারা আসতে চায় তাদের আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে।

বুড়ো পেতেলিৎসা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল। বেশ একটা গুরুগম্ভীর চালে বেরিয়ে পড়ে ঢ্যাঁড়া পেটাতে শুরু করল।

কামারশালার কাছে এসে তামাক খাবার জন্য সে থামল। চারপাশের বাড়ির গৃহকর্তারা এর মধ্যেই সেখানে এসে জড় হয়েছে। আন্নাও সে দলে ছিল। কাঠুরেদের মৎলবটা সে আগেই জেনেছে, তাই তার মনে হতে লাগল এই বিরাট ব্যাপারটার সেও যেন একজন অংশীদার।

'দেখ কী কান্ড,' বিস্ময়ে মাথার পিছনটা চুলকতে চুলকতে কামার বলল, 'কী দরকার ছিল বাপু, এমন দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার ?'

'শেষকালে যদি কথা না রাখতে পারে, তখন কী হবে ?' চোখ পিটপিট করতে করতে জিজ্ঞেস করল এক বুড়ো। তার ছেলে আর নাতিরাও বনে কাজ করে।

'কুমে, আপনার জিভ যেন খসে পড়ে যায়, কী অলক্ষুণে কথা!' বুড়ো খবরদার জ্বলে উঠল।

সবাই হেসে উঠল, কিন্তু তবু প্রত্যেকের মনেই একটা চাপা আশংকা উঁকি মারতে থাকল। গতবছর কামেনিৎসের

কাঠুরেরা অমন এক প্রতিজ্ঞা করে শেষ পর্যন্ত আর তা রাখতে পারেনি। সেকথাই সবার মনে পড়ল। কামেনিৎসের কাঠুরেদের বদনাম পাসেকিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। আবার কোথায় পাসেকি আর কোথায় কামেনিৎস — ঘোড়ায় চড়েও এক দিনের বেশি পথ!

কাঠুরেদের পুরনো অভ্যাসমত সিগারেটের টুকরোটা পায়ে পিষে পেতেলিৎসা ঢ্যাঁড়ার কাঠিদুটো তুলে ধরে বেরিয়ে পড়ল। তার কাঁপা কাঁপা গলা আর ঢ্যাঁড়ার আওয়াজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল।

'আমাদের কাঠুরেরা বোধ হয় অনেকদিন থেকেই ঐসব আঁচ করেছে,' বুড়ো চোখ পিট পিট করে বলল, 'আচ্ছা ধূর্ত ওরা! কাউকে কিচ্ছু জানায়নি!'

'ওরা আসলে নিজেদের ক্ষমতা যাচাই করে দেখছিল, তাই চুপ করেছিল,' বলল কামার।

'আমার স্বামীও কিচ্ছু বলেনি,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল একটি চটপটে মেয়ে, খালি পায়ের উপর গালোশ পরা, 'কেবল গত সপ্তাহে সে আর থাকতে না পেরে বলে ফেলেছিল, একটা মস্ত কিছুতে ওরা হাত দিয়েছে। ব্যাপারটা কী তা আর আমি জিজ্ঞেস করিনি।'

সবাই একসঙ্গে কথা বলতে সুরু করল। কারো বা স্বামী বনে কাজ করে, কারো বা ছেলে। কেবল আন্না একা এদের

বাইরে পড়ে। সবাই জানে য়াৎসিনার মেয়ের এখন আর বনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাই তার সঙ্গে কেউ একটা কথাও বলল না।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আন্নার মুখ রক্তলাল হয়ে উঠল।

হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি এ চিঠির কথা অনেক আগেই জানি! এক মাস আগেই ইভান শেকেতা একথা আমায় বলেছে!'

কথাটা বলেই গালোশ পরা মেয়েটির দিকে সে চ্যালেঞ্জের ভাবে তাকাল।

## ৭

রবিবার এল। ভোর থেকে চোর্নয়ের পথ লোকেভর্তি। আন্না তার জানলা থেকে দেখতে পেল, কাঠুরে আর তাদের বউরা রবিবারের সাজসজ্জা করে তার বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে। পুরুষদের পরনে ধূসর ঘরে কাটা সুতোর জ্যাকেট, তাতে সবুজ বা কালো ফ্ল্যানেলের কিনারা। মাথায় টুপি, অবশ্যম্ভাবী ছোট্ট ফার গুচ্ছটি তার ফিতের গোঁজা। মেয়েদের পরনে গরম ফোলা গুনিয়া* আর সাদা কুঁচি দেওয়া স্কার্ট।

যে সব বুড়োদের পক্ষে চোর্নয়ে পর্যন্ত হাঁটা সম্ভব নয় কমসমল সদস্যরা যৌথখামারের ঘোড়ার গাড়িতে করে তাদের নিয়ে চলেছে। গলায় ঘণ্টা বাঁধা ঘোড়াগুলো ঝিন্‌ঝিন্ শব্দ

---

* মেয়েদের বহির্বাস।

তুলে পুরো দমে ছুটে চলেছে পথচারীদের গায়ে বরফের গুঁড়ো ছিটিয়ে।

রাস্তা ফাঁকা হলে পর আন্না তার গুনিয়া পরে নিল, মাথায় বাঁধল রুমাল। তারপর বাড়ির দরজায় তালা মেরে বেরিয়ে পড়ল চোর্নয়ের পথে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর সে পেঁছিল কাঠুরেদের কারখানার দোতলা দপ্তরে।

সভা তখনো সুরু হয়নি: চারদিকের গ্রাম থেকে কাঠুরেরা দলে দলে সবাই আসছে। দপ্তরের সামনের ছোট্ট ময়দানটায় কী ভীড় আর গোলমাল, যেন মেলা বসে গেছে।

এত লোকজন দেখে আন্না ঘাবড়ে গেল। একটু ফাঁকা জায়গার জন্য সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বারান্দায় পা দিতেই চোখে পড়ল ইভান একদল তরুণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে। কী লম্বা বা বা, চওড়া কাঁধদুটো দেখ, জ্যাকেটটা কী সুন্দর করে পরেছে! টুপি আর নতুন জুতো জোড়াও সুন্দর মানিয়েছে। কী খাসাই না দেখাচ্ছে! ইভান হয়ত অনুভব করল, আন্নার চোখদুটো তার দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে কারণ একবার সে ঘুরে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার গল্প করতে লাগল।

ওর দিকে না তাকিয়ে চলে যাওয়াই ছিল ভাল। কিন্তু আন্না তা করতে পারল না। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে একেবারে শেকেতার পাশে এসেই দাঁড়িয়েছে।

'কী খবর ইভান,' বেশ নরম করে আন্না ডাকল।

ইভান ফিরে তাকাল। তার মুখের সব আনন্দ হাসি একমুহূর্তে নিভে গেছে।

'আমি যে এখানেই আসছিলাম তা নয়,' তার উপস্থিতির কৈফিয়ৎ দেবার জন্যই যেন সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সেট্‌ল্‌মেণ্টের পথে একবার উঁকি মেরে গেলাম।'

দুজনে তারা গেটের দিকে এগিয়ে গেল, ভিড় সেখানে পাৎলা।

'তারপর কেমন চলছে সবকিছু আন্না?' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইভান অবশেষে জিজ্ঞেস করল।

'ভালই।'

'আমাদের আজকের সভা দেখছ তো? হয়ত দপ্তরের ঘরে সবাইকে ধরবে না... ইস্কুলবাড়িতে সভাটা করতে হবে, সেখানে জায়গা বেশি... তুমি কি থাকবে, না যাবে?'

'দেখি, একটুখানি থাকতেও পারি...' আন্না বলল, 'জ্যাকেটটা অমন করে ছিঁড়লে কী করে?' ইভানের হাতের নিচে একটা ফুটো দেখে সে হঠাৎ বলে উঠল।

'ভগবান জানেন,' লজ্জিত হয়ে ফুটোটা আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে ইভান বলল, 'মোটা হচ্ছি, তাই বোধ হয়।'

'খুলে ফেল জামাটা,' আন্নার গলা প্রায় শোনাই গেল না, 'আমি সেলাই করে দেব। ছুঁচসুতো আমার সঙ্গে রয়েছে।'

'এইখানে সেলাই করবে, লোকজনের সামনে?' ইভান পিছন দিকে তাকিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, ঐ ঘোড়াগাড়িগুলোর আড়ালে চলি,' আন্না বলল, 'ওখানে কেউ নেই।'

চকটার অন্যদিকে আন্না এগোল। ইভান অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলল তার পিছু পিছু।

গাড়িগুলোর আড়ালে এসে ইভান জ্যাকেটটা খুলে ফেলে শুধু ভেস্ট পরেই দাঁড়িয়ে রইল। আন্না তার ব্লাউজের গায়ে লাগান একটা ছুঁচ বের করল, তাতে লম্বা সুতো পরান। তারপর ছেঁড়া জায়গা সেলাই করতে বসে গেল। ইভান যদি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে খুসী মনে সারাদিন ধরে সেলাই করে যেতে পারে।

'পাসেকির লোকেরা বলছিল তুমি গোরু কিনেছ, সত্যি নাকি?' কিছুক্ষণের নীরবতার পর ইভান জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। সেইসঙ্গে একটা গাড়ি আর ঘাস... একবার দেখে যেও না, আসবে?' ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করল আন্না।

'আসব একদিন,' আন্নার মনে ব্যথা না দেবার জন্য ইভান বলল, 'সময়ই পাই না। আন্না, তুমি কিন্তু ভুল করছ। তোমার উচিত যৌথখামারে যোগ দেওয়া। তোমার গাঁয়ের লোকেরা বলছিল: "কেবল তিনজন এখনো বাইরে রয়েছে — তাদের দুজন ছিল এককালে কুর্কুল*, অন্যটি হচ্ছে য়াৎসিনার মেয়ে!"'

---

* ধনী চাষী, মজুর খাটিয়ে চাষ করে।

'আমি আর কুর্কুলরা এক হলাম? কে বলেছে একথা?' আন্না রেগে উঠল, 'আমার নামে এমন কথা রটায়, আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো সব!'

'কুর্কুলদের দলে হয়ত নেই, কিন্তু তাদের সহায় হয়েছো সেটাও ঠিক।'

'যৌথখামারে গিয়ে আমি কী করব?' সেলাইয়ের উপর আরো ঝুঁকে পড়ে আন্না বিষণ্নবদনে জিজ্ঞেস করল।

'অন্যেরা যা করছে।'

'আমার নিজেরই খামার আছে।'

'তা থেকে তুমি কী আনন্দটা পাও, বল?'

'ভগবানের কৃপায় ঐ খামার থেকেই আমার অন্ন জুটছে...'

'সেটা তো কথা নয়,' ইভান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী করে তোমায় বোঝাই?.. সবাই একসঙ্গে হয়েছে, অথচ তুমি আলাদা হয়ে রইলে, একেবারে একা, যেন অন্যদের চেয়ে তুমি খারাপ।'

'খারাপ তো খারাপ, আমার তাতে কিচ্ছু এসে যায় না, বয়েই গেল!..'

সুতোটা দাঁত দিয়ে কেটে জ্যাকেটটা একবার ঝেড়ে সে নিঃশব্দে ইভানকে দিল।

'ধন্যবাদ,' ইভান স্বস্তির সুরে বলল, 'আচ্ছা, এবার তবে আমার যেতে হয় আন্না। ছেলেরা আমার খোঁজ করতে সুরু করবে... সত্যি থেকে যাও, সেটল্‌মেণ্টে যাবার প্রচুর সময় পাবে।'

'জানি না,' আন্না দুঃখের সঙ্গে বলল, যদিও ইভান তাকে থাকতে বলায় মনে মনে সে ভারি খুসী।

ইভান তার দলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। আন্না ভিড়ের মধ্যে তার সচল টুপিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল — ফার গুচ্ছ লাগান পিছনে ঠেলে দেওয়া টুপিটা।

সভাটা সত্যিই ইস্কুলবাড়িতেই হল। দুটো ক্লাসঘরের মাঝের দরজাটা রইল খোলা, ডেস্কগুলো সব একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘাড় গলা বাড়িয়ে ভিতরে তাকান ছাড়া অনেকের অন্য উপায় রইল না।

সভার প্রেসিডিয়াম যেখানে বসেছে, আন্না গিয়ে সেই ঘরে এককোণে ডেস্কের এক প্রান্তে বসার জায়গা করল। তার পাশেই বসেছে পাসেকি গাঁয়ের খবরদার বুড়ো পেতেলিৎসা, ভোরবেলায় সে চোর্নয়েতে এসে পৌঁছেছে।

ইভান বসেছে প্রেসিডিয়ামে। একপাশে তার কাঠের ছাউনির ভারপ্রাপ্ত নেমেশ — লালগাল লোকটি, এখনও যেন যৌবনে ভরা, আরেক পাশে এক দশাসই ভদ্রলোক, মস্ত মুখ আর স্বচ্ছ ধূসর খুসিভরা চোখ। সে রুসিঙ্কো, কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটির মুখ্য সম্পাদক।

রুসিঙ্কোর পাশে বসেছিলেন এক মাঝবয়সী টাকমাথা ভদ্রলোক, গলায় উলের মাফলার জড়ান। এ লোকটিকে আন্না আগে কখনো দেখেনি। ভদ্রলোককে দেখে আন্নার কেমন করুণা হল। বিষণ্ণ চেহারা দেখে মনে হয় তাঁর খুব গুরুতর কোনো

অসুখ আছে। ভদ্রলোক থেকে থেকেই ফিরে সম্পাদককে হেসে হেসে কী যেন বলছিলেন। কিন্তু তাঁর হাসিটাও কেমন রুগ্ন।

'দাদু, ঐ টাকমাথা ভদ্রলোকটি কে?' আন্না পেতেলিৎসাকে জিজ্ঞেস করল।

'ডাকাত,' খবরদার খবর দিল।

'সেকি, যাঃ!'

'সত্যি বলছি ডাকাত,' পেতেলিৎসা আবার বলল, 'ওর পিছনে যে য়ারভেৎস কাঠের ছাউনির লোকেরা বসে রয়েছে ওরা প্রত্যেকেই ডাকাত। ও হল ওদের সর্দার!'

'কেন, ওরা কি খুনখারাপী করেছে?' আন্না সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞেস করল।

'না,' খবরদার মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি বিনা মিথ্যা আমি কখনো বলি না। কিন্তু ওরা দুবার আমাদের দলকে হারিয়ে দিয়ে পতাকা নিয়ে গেছে। এখন আবার তৃতীয়বার হারাতে চায়, আমাদের লজ্জা দিতে চায়। লোকগুলো খাঁটি গুণ্ডা!'

আন্না হেসে উঠল:

'কিন্তু এতে তো গুণ্ডামির কিছু নেই!'

তবু এরপর থেকে মাফলার জড়ান সেই লোকটার প্রতি আন্না আর কোনরকম সহানুভূতি অনুভব করল না। এমন কি নেমেশ লোকটাকে সিগারেট দেওয়ায় আন্নার বিরক্তি লাগল।

ঘরে প্রচুর গোলমাল, লোকেরা আসন নিচ্ছে, চেঁচিয়ে এ ওকে ডাকছে।

রুসিঙ্কো ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছে। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সে সযত্নে লাল টেবিলকাভারটার ভাঁজগুলো ঠিক করতে করতে সবার দিকে তাকিয়ে আছে আগ্রহ ভরে। কাউকে যেন খুঁজছে। অবশেষে অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল:

'কমরেডরা!'

তারপর আরো প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে সুরু করল:

'কমরেডরা! মানুষের যত দুর্ভাগ্য আছে তার মধ্যে নিঃসঙ্গতা হল সবচেয়ে ভয়াবহ। একলা মানুষের জীবনে আনন্দ নেই, কাজে আনন্দ নেই, ভ্রমণে আনন্দ নেই। বেশি কিছু বলার দরকার নেই। আপনারা নিজেরাই কি এই দুঃখ জানেন না? লোকদের মাঝখানে থাকলে মনে হয় মানুষ যেন পাখায় ভর করে উড়ে চলেছে। আমরা সোভিয়েত জনগণ, আমাদের কাছ থেকে নিঃসঙ্গতা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, রোদ উঠলে যেমন কুয়াশা সরে যায়। এই যে আজ আমরা সবাই একটা জরুরী দলিলের আলোচনায় এখানে সমবেত হয়েছি, এ যেমন আনন্দের তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এর ফলে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে, আমাদেরও সুখ বাড়বে। সুখের প্রয়োজন নেই, এমন লোক কি কেউ আছে?'

সম্পাদকের কথা শুনে আন্না প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল — ওর কথাই বলছে নাকি, ওরই নিঃসঙ্গতা আর না-পাওয়া সুখের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার কথা! কিন্তু ক্রমশ তার ভয় দূর হয়ে গেল। সম্পাদক বলেই চলেছে। আন্নার সঙ্গে

কিন্তু সেকথার কোন সম্পর্ক নেই। পেতোলিৎসার ছেলে, চোর্নয়ের স্তেপান ফিওদরভিচের ছেলে, ইভান শেকেতা প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে সে কথার সম্পর্ক। তাদের জীবন আর কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে। ওরা খুব গরম গরম তর্কাতর্কি জুড়ল, কিন্তু তার মধ্যে আন্নার কোনই স্থান নেই...

তারপর নেমেশ চিঠিটা পড়ে শোনাল।

তার পড়া হয়ে গেলে পর কাঠুরেরা টেবিলের কাছে গিয়ে চিঠিতে নাম সই করে দিল। প্রত্যেকেই খুব ধীরস্থির শান্তভাব বজায় রাখতে চাইল কিন্তু ভিতরের উত্তেজনা চাপা রইল না। শেকেতাও তার আবেগ চেপে রাখতে পারল না। কাগজের উপর সে ঝুঁকে পড়ল, আন্না গলা বাড়িয়ে দেখল, তার ঠোঁটদুটো নড়ছে, কলমটা কাঁপছে।

হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বুড়ো য়ুরকো পেতোলিৎসা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। কখন যে সে পাশ থেকে উঠে গেল, আন্না তা দেখতেও পায়নি।

'দাদু, কী চান?' কলমের দিকে পেতোলিৎসাকে হাত বাড়াতে দেখে নেমেশ বলল।

'তার মানে?' বুড়ো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল, 'আমি কি অমত করেছি নাকি?'

'আজ তো শুধু কাঠুরেরা সই করবে,' নেমেশ একটু হেসে বলল।

'আর আমরা?' পেতেলিৎসা রেগে উঠল, 'আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি! আমরাও যৌথখামারের লোক!'

'আমিও, আমিও তাই বলি!' দ্বপাশে কন্বই মেরে পেতেলিৎসার দিকে এসে বলল স্তেপান ফিওদরভিচ।

কিন্তু নেমেশ কিছ্বতেই রাজী হবে না, 'যৌথখামার আর কাঠ কাটা দ্বটো আলাদা ব্যাপার, একটার সঙ্গে আরেকটার কোন যোগ নেই।'

'বা বা, বেশ কথা কও!' পেতেলিৎসা হাতদ্বটো নেড়ে বলল, 'আমরা এখন সাধারণ লোক নই, রীতিমত যৌথখামারের সভ্য আর আমরা যখন যৌথখামারের সভ্য তখন সবকিছ্বর সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক আছে, কমরেড সভাপতি।'

'কিন্তু আপনারা তো আর শপথ করছেন না?' নেমেশ রেগে চেঁচিয়ে উঠল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, মেজাজ খারাপ কর না মিখাইলো,' সম্পাদক নেমেশের হাতটা ছ্বঁয়ে বলল, 'রেগে যেও না। ওঁরাও শপথ করবেন। আমরা সবাই করছি। এটা যে আমাদের সবার ব্যাপার।'

ঘরের চারিদিকে সমর্থনের গ্বঞ্জন উঠল, হাততালি স্বর্ব হল। ব্বড়ো পেতেলিৎসা বিজয়গর্বে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কলমটা দ্ববার কালিতে ডুবিয়ে নিল। তারপর বহ্বযত্ন করে নিজের নামটা লিখতে লাগল, প্রতিটি অক্ষর যতদ্বর সম্ভব বড় বড় করে, যাতে তার নামটা পরে সহরের লোকেদের ভাল করে চোখে পড়ে।

এখন এমন অবস্থা হয়েছে, যা কিছ্ব নিয়েই কথা হোক না

কেন — পাসেকি বা চোর্নয়ে কিম্বা য়ারভেৎসে, নয়ত শুধু রাস্তাতেই চলতে চলতে, শেষ পর্যন্ত কাঠুরেদের ব্যাপারটা উঠবেই।

পাসেকিতে উজগরদ থেকে একজন বক্তৃতা দিতে এলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল মানুষের উদ্ভব। অনেক শ্রোতা, প্রত্যেকে খুব মন দিয়েই বক্তৃতাটা শুনল। বক্তৃতা শেষ হলে পর বক্তা জিজ্ঞেস করলেন, কারো কোন প্রশ্ন আছে কিনা।

'আছেই তো!' দূরের এক কোণ থেকে শোনা গেল। 'কমরেড বক্তা এখানে আসার আগে য়ারভেৎসে গিয়েছিলেন। আমি জানতে চাই য়ারভেৎসের কাঠুরেরা কেমন কাজ করছে?'

'আরেকটা প্রশ্ন আছে,' আরেকজন বলল, 'পরুশ্কিভোয় নাকি এক ধরনের যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, শুনেছি একটা যন্ত্রে পাঁচজন মানুষের কাজ হয়, পুরো গাছ তুলে নেয়। ব্যাপারটা কী?'

বক্তা একটু ক্ষুণ্ণ হলেন: মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে এর কোনই যোগ নেই, এ প্রশ্নের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। শ্রোতারা ওদিকে বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

তারপর থেকে কমসমল সদস্যরা গ্রাম সোভিয়েতের সামনে একটা কাঠের ফলক দাঁড় করাল। তাতে প্রত্যেক দিন সকালবেলা কালিনা সিজাক গতদিনের কাঠ কাটার ফলাফল লিখে দিতে লাগল। ফলকের সামনে সবসময় ভিড়। আগের দিনের চেয়ে মোট উৎপাদ কম হলে সবাই গ্রাম সোভিয়েতে ঢুকে সভাপতিকে

বলত তক্ষুণি নেমেশকে টেলিফোন করে ঠিক খবর জেনে নিতে। 'এ কিছুতেই হতে পারে না। নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।'

প্রতিদিন সকালবেলা ফলকের চারধারে আবেগের বিপুল চাঞ্চল্য দেখা যেত: সবাই হয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত নয়ত রেগে যেত। কিন্তু আন্নার কাছে এর একটা অদ্ভুত ব্যক্তিগত তাৎপর্য দেখা দিল। ইভানের জীবনের দিকে একটা ছোট্ট জানলা এই ফলক, সেই জানলা দিয়ে সে দেখতে পেত তার ভালবাসার জনের কাজকর্ম কেমন চলেছে।

রোজ খুব সকালে, অন্যেরা তখনো বাড়ির কাজে ব্যস্ত, আন্না গ্রাম সোভিয়েতে যায়। চতুর্থ দলের নামটা কোথায় রয়েছে সেই দেখতেই ছোটে: উপরে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনের কাছাকাছি, না — ভগবান না করুন — একেবারে নিচে, কচ্ছপের কাছাকাছি ...

নিঃসঙ্গ মেয়েটির হৃদয় উত্তেজনা দুর্ভাবনা আর আনন্দের জন্য ব্যাকুল — সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন আন্না জীবনে যা কখনো পায়নি।

৮

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পাহাড়ে বেশ ক'দিন ধরে জোর বরফ পড়ল। গাছগুলো বরফের ফোলা ফোলা মোটা আবরণে ঢাকা পড়ল, সারা বন হয়ে উঠল নৈঃশব্দ্যের রাজ্য। কিন্তু সে শুধু দূর থেকেই। পাহাড়ে রাস্তায় বেরলেই জমা নৈঃশব্দ্যের অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

মিনিটে মিনিটে মোড় ঘুরে বেরিয়ে আসছে বরফঢাকা ঘোড়ার দল, কাঠবোঝাই তিনটনী কাঠবওয়া লরী। লরীড্রাইভাররা অধৈর্য হয়ে হর্ণ দিয়ে চলে, যতক্ষণ না ঘোড়ার গাড়িগুলো যেখানে পথ দেবার জন্য একপাশে সরে দাঁড়ান সম্ভব সে জায়গায় না পৌঁছয়। পাহাড়ের খাড়া গায়ে এখানে ওখানে বরফের পর্দা ছিঁড়ে ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া উঠছে আর করাতের সাঁই সাঁই, কুড়ুলের খট্‌খট্।

উপর থেকে কোথাও হঠাৎ হয়ত 'হুঁশিয়ার' ধ্বনি শোনা গেল — মুহূর্তের নীরবতা — তারপর রাজসিক এক বীচগাছের মাথাটা যেন নেহাৎ অনিচ্ছাতেই নড়ে ওঠে। আরেক মুহূর্ত পরেই দীর্ঘায়িত গুম্‌গুম্ ধ্বনি পাহাড় বেয়ে নেমে যাবে। বরফের গুঁড়ো গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠবে, বিস্ফোরণের ধোঁয়ার মতো গাছটার ডালপালা কেটে ফেলার জন্য ছুটে আসা কাঠুরেদের ঢেকে ফেলবে।

অবশেষে বরফ পড়া থামল।

অপ্রত্যাশিতভাবে বইতে সুরু করল দক্ষিণ হাওয়া, বসন্তের মতোই গরম পড়ল। বরফ গলতে সুরু করল, পাহাড়ের পাথরের উপর দিয়ে জলের ছোট ছোট ধারা ছুটে চলল, তাদের কলধ্বনি তখনো কিছুটা চাপা। কিন্তু তার পরদিনই বৃষ্টি হল, সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার ঝরঝরও হয়ে উঠল আরো জোরাল, আরো ভয়াবহ। ওদিকে বরফগলাও এমন জোর সুরু হল, মনে হল পাহাড়ের মাথায় কোথাও বুঝি বাঁধের

মুখ খুলে দিয়েছে আর তার জল দুরন্ত বেগে নামতে সুরু করেছে।

গিরিসঙ্কটগুলো জলের ঘোলা ধারায় ভরে গেল। পাইনের কাঁটা আর ফুলে ওঠা সাদা ফেনায় ঢাকা জলধারা সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম ভেঙে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

বরফ গলে পথ নীচু হয়ে গেল, সাঁকোগুলো হুড়মুড় করে ঘূর্ণিজলে ভেঙে পড়ে মিলিয়ে গেল। উপত্যকার বুকে নিরীহ নদীগুলো ফেঁপে ফুলে উঠে মাঠঘাট ডুবিয়ে দিল।

পাসোঁকি আর অন্যান্য গ্রামে সে রাত্রে আলো নিবল না। সবাই হয় নিজেদের বাড়ি নয় গ্রাম সোভিয়েতের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দূরে জলের গর্জন আর উচ্ছল আওয়াজ শুনতে লাগল।

শব্দ শুনে মনে হল একটা বিরাট পাত্র যেন আগুনে ফুটছে আর ফুটন্ত জল যত পাথর টেনে এনে ফেলছে।

পাসোঁকি গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি কাঠুরেদের ছাউনির দপ্তরকে টেলিফোনে ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেলল। কিন্তু টেলিফোনের মেয়েটি সাড়াই দেয় না। সভাপতি গোঁয়ারের মতো চেঁচিয়েই চলল, 'এক্স্চেঞ্জ! এক্স্চেঞ্জ!' সকালবেলা মনে হল গ্রামটা যেন একটা দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশের উপত্যকা ঘোলা জলে গেছে ভরে।

মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বদলে গেছে। সাদা সুন্দর রাজসিক পাহাড়টার এখন কালশিরে পড়া বিধ্বস্ত বেখাপ্পা

চেহারা। একরাত্রেই অনেকটা লম্বাও হয়ে গেছে বলে মনে হল, যেন হঠাৎ বিপদ সংকেত শুনে দীর্ঘকালের আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে। মেঘগুলো পাহাড়ের মাথায় হামাগুড়ি দিচ্ছে, খোঁচা খোঁচা বনের গায়ে লেগে তাদের ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থা।

আন্না আর ঘরে বসে থাকতে পারল না, গেল গ্রাম সোভিয়েতে। গ্রাম সোভিয়েতে তখন প্রচুর ভীড়, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক ভরপুর। ঠেলেঠুলে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে কালিনাকে দেখতে পেল। কামারের মেয়ে তখন জানলার কাছে বসে, মুখ ফ্যাকাশে, বয়সও যেন বেড়ে গেছে।

'কী ভীষণ ব্যাপার, কী সাংঘাতিক বিপর্যয়!' বলে চলেছে বুড়ো পেতেলিৎসা।

বুড়ো পুরনো দিনের কথা সুরু করল। বছর কুড়িক আগে নাকি একবার ঠিক এইরকমই হঠাৎ বরফ গলা সুরু হয়, জলে সবকিছু ভেসে যায়। তারপর প্রাগ থেকে ইঞ্জিনিয়ররা এসে আবার সাঁকোগুলো গড়ে তুলে পথগুলোকে খুলে দেয়। তা করতে পাঁচটি মাস সময় লাগে।

'পাঁচ মাস!' ভুরু কুঁচকে সভাপতি কপাল ঘষতে লাগল।

'পাঁচ মাস চলবে না!' কালিনা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা যে কথা দিয়েছি, তাই না? এখন আর পাঁচ মাস কিছুতেই লাগবে না!'

'চেঁচিও না মা,' কামার বলল, 'চাওয়া আর করা এক কথা নয়।'

'তাছাড়া ক'মাস লাগবে তা কেউ বলেওনি,' সভাপতি যোগ করে দিল, 'ওরা আগে কী হয়েছিল, তাই শুধু বলছে।'

'এখন আর তা কিছুতেই হবে না!' কালিনা নাছোড়বান্দা।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে পাসেকির কয়েকটি ছোট ছেলে দেখতে পেল চোর্নয়ের দিক থেকে কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চড়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তো কাদা ছিটতে ছিটতে প্রাণপণ জোরে গ্রামের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল। গ্রামের ওপারের জলে ডোবা ডাঙাটা দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ঐ যে, দেখ, দেখ! তিনজন লোক!'

আন্না বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। গ্রামের অন্য সবাইও ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। বাচ্চাদের কথামতো জলে ডোবা ডাঙাটার দিকে তাকিয়ে তারা ভাবতে লাগল, এই সময়ে বিপদ মাথায় করে কারা আসতে পারে পাসেকিতে।

ঘোড়াগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে সাঁতার কেটে আসছে — পেট পর্যন্ত জলে ডোবা। ঘোড়সওয়ারদের গ্রামের প্রান্তে এসে পৌঁছতে বেশ সময় লাগল। জল ওখানে কিছুটা কম, কিন্তু কাদায় ঘোড়াগুলোর পা আটকে যাচ্ছিল। এতক্ষণে সবাই ঘোড়সওয়ারদের চিনতে পারল — রুসিঙ্কো, নেমেশ আর বনের রেঞ্জার পপভিচ্। মুখ ভর্তি তাদের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, লাল চোখগুলো গর্তে বসে গেছে, রুসিঙ্কোকেও আগের মতো অত শক্তিমান মনে হচ্ছে না। মাথায় তার টুপি নেই, কারণ

শীত গ্রীষ্ম কোন সময়েই সে টুপি ব্যবহার করে না, এমন কি চরম ঠাণ্ডার সময়েও না।

সবাই ঘোড়সওয়ারদের ঘিরে ধরে দুর্যোগের বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। মেয়েরা সবাই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল:

'কমরেড নেমেশ! ভাসিল গাবড্‌দার কী খবর!'

'ভাল আছে,' নেমেশ জবাব দিল।

'আমার স্বামী? স্তেপান মগুলা!'

'বহাল তবিয়তে আছে। কোন ক্ষতি হয়নি!'

'পাসেকির সবাই ভাল আছে!' রেঞ্জার চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল, 'চোর্নয়ের কয়েকজন অল্প জখম হয়েছে।' কয়েকটা নাম সে আউড়ে গেল।

আন্না দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে রইল: এবার ইভানের নাম বলবে। কিন্তু না, শেকেতার কথা কেউ বলল না। বেঁচে আছে, তার ইভান বেঁচে আছে!

গ্রামের ময়দানে এসে ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া থেকে নামল; ক্লান্তিতে টলতে টলতে তারা গ্রাম সোভিয়েতের দিকে এগোতে লাগল। সভাপতি সবাইকে ঘরে ঢুকতে বারণ করতে যাচ্ছিল, ঘোড়সওয়ারদের একটু জিরিয়ে টিরিয়ে জামাকাপড় শুকিয়ে নেবার সময় দিতে হবে তো। কিন্তু সম্পাদক তার পোষাকের হাতা ছুঁয়ে বলল:

'আমাদের এখন লোকেরই দরকার, যত বেশি লোক হয় তত ভাল।'

কাউকে ডাকার আর দরকার নেই — ছেলে বুড়ো সবাই হাজির। সবাই গ্রাম সোভিয়েতে ভীড় করে উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশায় নবাগতদের দিকে চেয়ে রইল।

রুসিঙ্কো তার অভ্যাস মতো একটু অপেক্ষা করল, তারপর বলতে সুরু করল:

'কমরেডরা, জল এখন কমতে সুরু করেছে, কিন্তু এর মধ্যেই খবর পাওয়া গেছে মার্কভিৎস পাহাড়ের চারপাশের পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে আর ছোট বড় আঠারটা সাঁকো গেছে ভেসে। কাঠুরেদের ছাউনিতে মোটর আর ঘোড়া গাড়ির যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগবে তিন মাস, এই হল আমাদের ইঞ্জিনিয়রদের হিসেব। তার মানে আসছে তিন মাস মার্কভিৎস পাহাড় থেকে আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গাছের গুঁড়ি চালান দেওয়া যাবে না ...'

'তিন মাস — তার মানে এক বছরের সিকি ভাগ!' কালিনা বলল।

'হ্যাঁ,' রুসিঙ্কো সমর্থন করে বলল, 'এক বছরের সিকি ভাগ... সেই জন্যই আমরা এখানে এসেছি আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে, আপনাদের মত জানতে। এই তিন মাস কাঠ চালান একেবারে বন্ধ থাকবে, এতে আপনারা রাজী আছেন?'

সোজাসুজি এরকমভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করা হবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। সবাই বলতে চায়, 'না, আমরা রাজী নই।' কিন্তু তার আগে কী করে চালানের কাজটা সম্ভব করা যায় তা

কেউ ভেবে উঠতে পারল না। তাই সবাই চমকে উঠল একজনের প্রশ্ন শুনে:

'কমরেড সম্পাদক, আপনার কী মত?'

'আঞ্চলিক পার্টি কমিটির মত হল লোকেরা যদি নিজেরা ভার নেয় তবে কাজটা ত্রিশ দিনেই সম্পূর্ণ হতে পারে,' রুসিঙ্কো বলল।

ত্রিশ দিনে কী ভাবে কাজটা সারা যাবে সেকথা রুসিঙ্কো তখনো বলেনি, কিন্তু তবু সবাই খুবই আশ্বস্ত বোধ করতে লাগল। কাজটা যে হতে পারবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হল।

সবাই এক সঙ্গে কথা বলা, চলাফেরা জুড়ে দিল।

'ঠিক, আমরাও তাই মনে করি!' বুড়ো পেতেলিংসা চিৎকার করে উঠল, 'আমরা কথা দিয়েছি, এখন তা রাখতেই হবে। কেবল সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমাদের মেয়েরাও বোধ হয় আমাদের সাহায্য করতে পারবে, তাই না কমরেড সম্পাদক?'

'মেয়েরা কি খালি সারাক্ষণ সাহায্য করিয়ে ছাড়া আর কিছু হতে পারে না,' রুসিঙ্কো হেসে বলল, 'মেয়েদেরও ক্ষমতা আছে।' সবাইকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ান আন্নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'কী নাম আপনার?'

আন্না জবাব দিল, একটু ঘাবড়ে গিয়ে।

'রাষ্ট্রের সম্পত্তি আর কাঠুরেদের মানসম্মান নিয়ে যখন কথা তখন আপনারা কি মনে করেন আন্না য়াংসিনা তার ঘরে

বসে থাকবে?' রুসিঙেকা বলে চলল, 'আপনারা কি ভাবেন এই সম্পত্তি আর আমাদের মানসম্মানের ব্যাপার নিয়ে আন্না পুরুষদের চেয়ে কম চিন্তিত? ওর ঐ শান্ত লাজুক চেহারা দেখে ভুল করবেন না। ওর চোখ দেখেই আমি বলে দিতে পারি, আন্না খুব ভাল কর্মী। আমরা যদি সামনে তাকিয়ে দেখি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে ভাবি তবেই বুঝতে পারব, ঐ পথ দিয়ে তো শুধু গাছের গুঁড়ি আসবে না, আসবে আমাদের ভবিষ্যৎ — ওর ভবিষ্যৎ, আন্না য়াংসিনার ভবিষ্যৎ। ঠিক কথা না?'

'ঠিক, ঠিক,' আন্নার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল। আন্না ঘুরে দেখল কালিনা।

'জল একেবারে নেমে যাবার অপেক্ষায় না থেকে আসুন আমরা এক্ষুণি সুরু করি,' রুসিঙেকা বলে চলল, 'তাড়াতাড়ি কুড়ুল করাৎ কোদাল তুলে নিতে হবে। খারাপ যেগুলো সেগুলো এক্ষুণি সারাই করতে পাঠাতে হবে।'

'আমরা তার ভার নিচ্ছি,' কামার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

'ব্রিজের কাঠের কী হবে?' সভাপতি বলল, 'প্রচুর কাঠ লাগবে।'

রুসিঙেকা ভুরু কোঁচকাল। নেমেশ এত জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল যে বাতির শিখাটা কেঁপে উঠে নিভে যায় আর কি।

'কাঠের গুঁড়িই তো আমাদের ভাবনা,' নেমেশ বলল, 'আমরা এখন তাদের নামাই কী করে? কাঠুরেদের ছাউনি থেকে একটা নতুন পথ বানাতে হবে।'

'কঠিন কাজ,' বুড়ো পেতেলিংসা মাথা নেড়ে বলল।

'সবচেয়ে খারাপ সময়ও লাগবে বেশি,' সম্পাদক বলল, 'তার উপর আবার কাঠুরেদের চারটে দলকে পাহাড়ে পাঠাতে হবে। সব হিসেব করে দেখা হয়েছে।'

'তার মানে এ সময়ে শুধু যে কাঠের চালানই কমে যাবে তা নয়?' সভাপতি জিজ্ঞেস করল।

'তাই তো মনে হচ্ছে, তাই তো মনে হচ্ছে,' রুসিঙ্কো ভাবতে ভাবতে বলল।

চোর্নয়ের সেই রবিবারটার কথা আন্নার মনে পড়ল। মনে পড়ল চিঠিটার দীর্ঘ পাতার উপর ইভান ঝুঁকে পড়েছে, হাতে তার কলমটা কাঁপছে। আর মনে পড়ল গ্রাম সোভিয়েতের সামনের সেই ফলকটার কথা। এখন কেউ সেটা দেখে না, কারণ তার সংখ্যাগুলো এখন এক জায়গাতেই থেমে আছে। আন্না অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল, মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল তাদের সবারই হাতদুটো যেন বাঁধা, তার, ইভানের, প্রত্যেকের।

## ৯

জল ধীরে ধীরে কমতে লাগল, যেন নেহাৎ অনিচ্ছাতেই। পড়ে রইল পাঁক আর ডালপালা কাঠকুটো, পাথর আর গাছের গাদা। আশেপাশের গ্রামের মেয়েপুরুষ কোদাল আর স্ট্রেচার নিয়ে জলে ডোবা রাস্তা ধরেই বেরিয়ে পড়ল মার্কভিৎস পাহাড়ের

দিকে। জল পুরোপুরি নেমে যাবার অপেক্ষায় তারা আর বসে রইল না। প্রত্যেক গ্রামকে একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভার দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে সবাই পরিখা খোঁড়া আর বাঁধ বাঁধার কাজে লেগে গেল, ঢালুগুলোকে পাথর দিয়ে শক্ত করে গেঁথে তুলতে লাগল।

যৌথখামারের সদস্যরা পালা করে কাজ করছে — একদল দিনে, আরেকদল রাতে। সন্ধ্যাবেলা সারা পথ জুড়ে আগুন জ্বালান হয়। উঁচুতে কাঠুরেদের ছাউনি থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা শিবিরে আলোর মালা জ্বলে উঠেছে।

আন্না বলেছে ওকে কালিনার দলে রাখতে। কালিনাও তাকে সানন্দে দলে নিয়েছে। দুজনে একসঙ্গে পাঁক ভেঙে বহু কষ্টে চলেছে কাজের ক্ষেত্রে, যেখানে গিরিবর্ত্ম থেকে একটা ছোট্ট নদী এসে পড়েছে উপত্যকায়।

লক্ষ্যে পৌঁছে তবে তারা বুঝতে পারল জলে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। এই কয়েকদিন আগেও যেখানে কাঠের ব্রিজ ছিল, এখন সেখানে জলের উপর মাথা তুলে রয়েছে কয়েকটা ভাঙাচোরা টেরাবাঁকা খুঁটি। পাহাড়ের গায়ের রাস্তাটা হয় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে নয়ত গেছে ধ্বসে। অনেক জায়গায় খাড়া ঢালুতে মাটি ধুয়ে গিয়ে তলের লালচে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। তার গায়ে অসংখ্য ফাটল। বন্যায় ঝেঁটিয়ে আনা গাছের শিকড় শূন্যে ঝুলছে যেন দৈত্য মাকড়সার বড় বড় পা।

'হায় ভগবান!' আন্না ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'এ সব কি সারান যাবে!'

প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার এই বহর দেখে এমন কি কালিনার অদম্য উৎসাহও দমে গেল। সেও আন্নার মতো কিছুক্ষণ হতাশায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু একটু পরেই সেই হতাশার জায়গায় দেখা দিল গোঁ, প্রকৃতিকে বশ করার, জয় করার এক প্রবল আগ্রহ।

আন্না আবার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'হায় ভগবান!'

কালিনা রেগে উঠল, 'নাকি কান্না থামাও তো? এখন চল!'

দুজনে নীরবে কাজ সুরু করল। আন্না চোখ নামিয়ে কারো দিকে না তাকিয়ে তার কোদালে মাটি তুলে নিয়ে স্ট্রেচারটার উপর ছুঁড়ে দিল। মাটি দিয়ে স্ট্রেচার ভরা হচ্ছে, কিন্তু যে পরিমাণ মাটি তুলে পথ তৈরী করতে হবে তার তুলনায় এটা তো কিছুই নয়। 'ত্রিশ দিন! তিন মাসেও একাজ শেষ হবে না,' আন্না মনে মনে ভাবল, 'আমিও তেমনি, গ্রাম সোভিয়েতে ওরা যা বলল তাই মেনে নিলাম!'

আন্না যতই কাজ করে, ততই রেগে ওঠে আর স্ট্রেচারে তত বেশি মাটি ছুঁড়ে ফেলে। আন্নার সঙ্গী কালিনা বলে উঠল, বড্ড বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে। আন্না তার উত্তরে খোঁচা দিয়ে বলল, 'তাতে কি, ওটুকু ভারে তুমি মরে যাবে না!' কালিনা জ্বলে উঠে অবাক হয়ে আন্নার দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

ঘণ্টা দুয়েক পর সারা এলাকায় পুরো দমে কাজ চলল। কাজের মধ্যে একটা ছন্দ দেখা দিল। বাইরের কারো চোখে সে ছন্দ ধরা পড়বার নয়, কিন্তু প্রত্যেক কর্মী সে ছন্দ অনুভব করল আর তা ভাঙতেও ভয় পেল। সবাই জেদের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। চারিদিকে কেবল কোদালের শব্দ আর জমা করা ভাঙা পাথরের আওয়াজ। সবার গরম লাগল। আন্না প্রথমে তার গুনিয়া খুলে ফেলল, তারপর জ্যাকেটটাও। শুধু রং-ওঠা সুতির ব্লাউজ পরেই সে কাজ করে চলল। বুড়ো পেতেলিংসাও তার কোট খুলে ফেলল। অন্যরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

প্রতি এক ঘণ্টা কাজের পর কালিনা বিশ্রামের জন্য পাঁচ মিনিট রেখেছে। বাবার ফাটাকাচ ঘড়িটা সে নিয়ে এসে পথের ধারের গাছের গায়ে টাঙিয়ে রেখেছে। এই ঘড়িটা দেখেই সে সবাইকে বিলম্বিত হাঁক দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে।

দিনের শেষে রুসিঙ্কো এসে পৌঁছল, সঙ্গে নেমেশ আর আরো কয়েকজন লোক। আন্না তাদের চেনে না। রুসিঙ্কোর বিরাট শরীরের তুলনায় তার ছাইরঙা মস্ত ঘোড়াটাকে বড় ছোট দেখাচ্ছিল। কাদায় তার জুতো জোড়া ভরে গেছে, কালো কোটের গায়েও শুকনো কাদা। মুখে পর পর কয়েকটি বিনিদ্র রাত্রির ছাপ।

'শুভদিন!' ঘোড়া থামিয়ে সে সকলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল।

'শুভদিন, কমরেড সম্পাদক,' অন্যেরাও নানা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

কাজের জায়গাটা দেখে নিয়ে রুসিঙ্কো হেসে বলল:

'খুব ভাল কমরেডরা, চমৎকার কাজ করেছেন দেখছি। বেশ দ্রুত কাজ হচ্ছে!' তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'য়ারভেৎসের ওদের মতোই ভাল কাজ হচ্ছে। কী বলেন?'

'বোধ হয় তার চেয়েও ভাল?!' কালিনা উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল।

'আমার তো ভয় হয়,' রুসিঙ্কো সহাস্য চোখদুটো কুঁচকে বলে উঠল, 'এক মাসের বদলে আপনারা কুড়ি দিনেই রাস্তাটা বানিয়ে ফেলবেন। কিন্তু কথা বলার কী দরকার! সবাই যদি এক সঙ্গে কাজ করে তবে সাধ্যের আর সীমা থাকে না!'

আন্না ভুরু কুঁচকে সম্পাদকের দিকে তাকাল। 'লোকটা কি ঠাট্টা করছে নাকি প্রবোধ দিচ্ছে আমাদের? কুড়ি দিন! কী প্রচণ্ড কাজ পড়ে রয়েছে!'

আন্না চারদিকটা একবার দেখে নিল। বুঝল রুসিঙ্কো ঠাট্টাও করছে না, প্রবোধও দিচ্ছে না। এই সকালবেলাতেও জায়গাটা একেবারে মসৃণ ঢালু ছিল, যেন ধ্বস নেমে সমান করে দিয়ে গেছে। আর এখন পাহাড়ের গায়ে একটা অলিন্দের মতো রেখা হয়ে গেছে; তিনজন লোক তাতে পাশাপাশি যেতে পারে। সে অলিন্দ বহুদূরে চলে গেছে।

রুসিঙ্কো ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়ল, কালিনা তার পাশে চলেছে, ভেজা পাথরে তার পা হড়কে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সম্পাদক তাকে বলে চলেছে, আসছে কাল থেকে প্রত্যেক এলাকায় রান্নার ব্যবস্থাও করা হবে, আর দিনের বেলায় যাদের কাজ  তাদের রাত্রে বাড়ি ফিরে না যাওয়াই ভাল, অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। একটু উঁচু আর শুকনো জায়গায় সাময়িক আস্তানা বানিয়ে সেখানেই রাত কাটানর ব্যবস্থা করা ভাল।

নেমেশ আরো কিছুক্ষণ থেকে গেল। বুড়োরা সবাই তাকে ঘিরে কাঠুরেদের ছাউনির খবর নিতে লাগল। নেমেশ জানাল চতুর্থ দলটা কয়েকদিন নিচে 'কচ্ছপের' কাছে থেকে আবার 'এরোপ্লেনের' কাছে উঠে গেছে। বুড়োরা তাতে সোল্লাসে সন্তোষ জানাল।

আন্না কথাবার্তা শুনল।

'আমরাও আমাদের যতদূর সাধ্য করব,' পেতেলিৎসা বেশ মুরুব্বী চালে বলল — তার ছেলেরা ঐ চতুর্থ দলেই রয়েছে — 'ব্রিজের জন্যই তো...'

'ও ব্রিজের কথা বলছ!' নেমেশ কথাটা চেপে রাখতে পারল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে গেল। এদের শুধু শুধু আরো দুর্ভাবনায় ফেলে কী লাভ।

'ব্রিজ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' নেমেশ হঠাৎ চটে বলে উঠল, 'কাঠের গুঁড়ি পেলেই আমরা ব্রিজ বানিয়ে ফেলব। ব্যস!'

অন্য কোন সময় হলে ফিরে খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠার আগে বুড়ো দুবার ভাবত না, কিন্তু এবার নেমেশের রাগের কারণ বুঝতে পেরে সে শুধু ভুরু কুঁচকে তার পুরোনো পাইপটায় জোরে জোরে টান মারতে লাগল।

এক ঘণ্টা পরে পাসেকি থেকে পরের দলটা এসে পেঁাছল। প্রথম দলটা বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হতে লাগল। কালিনা আর আন্না গেল সবার পরে। তাদের কাঁধ আর পাদুটো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। পিছল পাঁক ভরা পথ, হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর। দুজনে মুখ বুজে হেঁটে চলেছে। চারিদিকে সন্ধ্যার আগের নিস্তব্ধতা। কেবল উপত্যকার সব জায়গায় জলের উজ্জ্বল কুল্‌কুল্‌ শব্দ।

পাসেকির সেট্‌লমেণ্টে পেঁাছতে পেঁাছতে গোধূলি হয়ে গেল। কাদা এড়ানর জন্য আর পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য মেয়েরা বাঁয়ে বেঁকে নদীর পাথুরে তীরটা দিয়ে এগোতে লাগল। অপর পারের বানে ডোবা নিচু তীর আর মাঠঘাট তখন বহুদূর ছড়ান হ্রদের মতো চক্‌চক্‌ করছে। তার এখানে ওখানে কাঠের লম্বা সার, জলের ধাতুরঙের মসৃণ গায়ে কালো হয়ে ফুটে আছে।

মেয়েরা দেখতে পেল কয়েকজন লোক হাঁটুজলে নেমে কাঠের গুঁড়িগুলো নিয়ে কী যেন করছে।

'কী করছে ওরা?' কালিনা জিজ্ঞেস করল।

'বোধ হয় জ্বালানী কাঠের তালে ঘুরছে,' আন্না বলল, 'কত জ্বালানী কাঠ ভেসেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।'

তাই বটে। কিছুক্ষণ পরেই একটি ছেলের সঙ্গে তাদের দেখা হল। অত্যন্ত রোগা, ঠাণ্ডায় কাঁপছে, মাথায় খড়ের ছেঁড়া টুপি, নিচুজমির গ্রামের লোকরা গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে যেমন পরে। ছেলেটি দুটো মোটা মোটা ভেজা গুঁড়ি নিয়ে চলেছে, আর বোকার মতো দাঁত বের করে হাসছে।

আন্না ছেলেটিকে চিনতে পারল। মিখাইলো, মিকলা ভার্গার হাবা ভাইপো। ভার্গা অবশ্য সবাইকে বলে বেড়ায় তার এই 'পাগলা' ভাইপোটাকে সে নেহাৎ দয়া করেই রেখেছে। আসলে কিন্তু মিখাইলো কলের মানুষের মতো সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করে, আর সারা বছর ঐ ছেঁড়াখোঁড়া জামা কাপড়েই কাটায়।

'কোথায় যাচ্ছ মিখাইলো?' আন্না জিজ্ঞেস করল।

মিখাইলো খুক খুক করে হেসে বলল, 'জ্বালানী কাঠ নিয়ে যাচ্ছি ভুইকু বলেছে, জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসতে।' ছেলেটি বিরাট ভারে টলতে টলতে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে মেয়েরা গ্রামের আলো দেখতে পেল।

আর কয়েকটা বাড়ি পেরলেই তাদের পথ শেষ হয়, এমন সময় আন্না হঠাৎ থেমে গেল।

'কালিনা! দেখলে তো সবাই কেমন নিজের নিজের জন্য জ্বালানী কাঠ নিয়ে চলেছে?'

'দেখেছি, তাতে হয়েছে কী?'

'কিন্তু ঐ কাঠগুলো তো ব্রিজের...'

'ঠিক,' কালিনা সজাগ হয়ে উঠল।

'আমরা যদি কাঠগুলো জোগাড় করি তাহলে কেমন হয় কালিনা? কত কাঠ ভেসে এসেছে একবার ভেবে দেখ! একেবারে আমার বেড়ার গায়েও কাঠ এসে ঠেকেছে। আমি তো ভাবছিলাম ঐ কাঠটাকে সামনের গেটের কাজে লাগাব, গেটটা মেরামত করা প্রয়োজন।'

'তোমার মতলবটা কী?' সেটা আঁচ করতে পেরেই জিজ্ঞেস করল কালিনা।

'সবকটা কাঠ জোগাড় করে ব্রিজের কাজে লাগান!..'

দুজনেই এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন ভয় পেয়েছে পাছে তাদের মতলবটা কোন অলঙ্ঘনীয় বাধার ফলে ভেস্তে যায়। তাদের মন কিন্তু দ্রুত কাজ করে চলেছে, চারদিক থেকে জড় করা কাঠ দিয়ে কী করা যায় তার ছবি তারা মনে মনে আঁকতে সুরু করেছে।

হঠাৎ কিছুই না বলে আন্না আর কালিনা একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর অন্ধকারে দুজনে দুজনের হাত ধরে জোরে হাঁটতে সুরু করল, শেষ কালে দৌড়তেই লাগল, গ্রাম সোভিয়েতের উদ্দেশে।

গ্রাম সোভিয়েতে যে লোকটি তখন ডিউটিতে ছিল সে হাতে আর কোন কাজ না থাকায় বসে বসে খুব জটিল কায়দা করে বার বার একটা কাগজের উপর নিজের নাম লিখছিল।

কালিনা দ্রুত পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে রুমালটা

কানের পিছনে গংুজে দিয়ে অধীরভাবে টেলিফোনের হ্যাণ্ডেলটা ঘোরাতে লাগল।

'এক্‌স্‌চেঞ্জ!.. এক্‌স্‌চেঞ্জ!..' কালিনা ডাকল, 'এক্‌স্‌চেঞ্জ! দয়া করে কমরেড রুসিঙ্কোকে ডেকে দাও... পার্টির সম্পাদক রুসিঙ্কো। হ্যাঁ, তাঁকেই... হয় চোর্নয়েতে নয়ত য়ারভেৎসে আছেন। নিজের বাড়িতেও থাকতে পারেন...'

টেলিফোনের মেয়েটি রুসিঙ্কোকে খংুজছে আর কালিনা খালি রিসিভারটা একবার এহাত থেকে ওহাতে নিচ্ছে, আবার ওহাত থেকে এহাতে। অফিসের লোকটি কালিনার দিকে প্যাট্‌প্যাট্‌ করে চেয়ে থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর আরো দ্বিগুণ উৎসাহে তার সইয়ের জটিল কায়দাটা মক্‌স করতে লেগে গেল।

রুসিঙ্কোকে পাওয়া গেল স্লেগোভেৎসে। টেলিফোনে জবাব দিতেই কালিনা তার গলা চিনতে পারল।

'কমরেড সম্পাদক!' কালিনা চেঁচাতে লাগল, রুসিঙ্কো কিন্তু এমনিতেই তার গলা বেশ পরিষ্কার শুনতে পেত, 'পাসেকি থেকে আমি কালিনা সিজাক কথা বলছি।'

'কী, ব্যাপার কী?' রুসিঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

'কমরেড সম্পাদক!' কালিনা আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কালকে আমরা কাঠ পাব! অজস্র কাঠ!' উত্তেজনার চোটে অফিসের সেই লোকটির কলমটা ছিনিয়ে নিয়ে কালিনা ডেস্কের আরেক দিকে ছংুড়ে দিল।

‘ওরকম চেঁচিয়ো না,’ রুসিঙ্কো বলল, ‘আস্তে আস্তে কথা বল, আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি। কী কাঠ?’

‘পুরোনো ব্রিজের, কমরেড সম্পাদক, যেগুলো জলে ভেসে গেছে। লোকেরা সব জ্বালানী হিসেবে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জ্বালানী হিসেবে ওগুলোকে কি ব্যবহার করা উচিত?’

‘ও এই ব্যাপার!’ রুসিঙ্কো হঠাৎ এত আহ্লাদে হেসে উঠল যে টেলিফোনের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আন্নাও সে হাসি শুনতে পেরে কালিনার দিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকাল।

‘আপনি হাসছেন কেন?’ কালিনা নিরাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ভাল মতলব না?’

‘ভাল বলেই তো হাসছি, অত্যন্ত ভাল!’ রুসিঙ্কো বলল।

‘এটা আমার বুদ্ধি না,’ কালিনা তাড়াতাড়ি বলল, ‘আন্না য়াৎসিনার। আমাদের গ্রামের আন্না য়াৎসিনার। ওর সঙ্গে আপনি কথা বলবেন? এখানেই রয়েছে।’

আন্না একপা পিছিয়ে গিয়ে দুহাত নেড়ে বলল:

‘ও বাবা, আমি কথা বলতে পারব না... না, না কালিনা...’

কিন্তু রুসিঙ্কো কিছুতেই ছাড়ে না। আন্না শেষ কালে লজ্জায় লাল হয়ে কোনরকমে রিসিভারটা তুলে নিল। জীবনে এই প্রথম। দু হাতে অদ্ভুতভাবে রিসিভারটা ধরে সে অনভ্যাসবশতঃ নানা রকম মুখভঙ্গী করতে লাগল। রুসিঙ্কোর প্রায় একটা কথাও বুঝতে পারল না। রুসিঙ্কো যে তার প্রশংসা করছে সেটা অবশ্য আঁচ করতে পারল, তার ফলে সে

আরো অপ্রস্তুত। চোখদুটো তখন তার আনন্দে জ্বলছে, সে খালি একটা কথাই বলে চলেছে:

'ঠিক আছে, কমরেড সম্পাদক... ঠিক আছে...'

## ১০

মার্চ মাসে শেষ ব্রিজটা তৈরী হয়ে গেল। কাঠুরেদের ছাউনির কাছেই একটা গভীর খাদের ভিতর থেকে মিনারের মতো দুটো কাঠের স্তম্ভ উঠল। দড়িতে ঝুলে ঝুলে লোকেরা স্তম্ভদুটোর সঙ্গে সার সার আরো অনেক কাঠ জুড়ে দিল।

খাদ পর্যন্ত রাস্তা আগেই খুলে গেছে, পুরো কাজটা সম্পূর্ণ হওয়ার নির্দিষ্ট দিনটা এই ব্রিজ গড়ে ওঠার উপরেই নির্ভর করছে।

নেমেশ সারা দিন রাত এখানেই আছে, রুসিংকোও এসে পড়ল। এমনকি কাঠুরেরাও মাঝে মাঝে এসে দেখতে লাগল গ্রামবাসীরা কেমন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছে। নির্দিষ্ট দিনের কথা কেউ উল্লেখ করছে না, কাজের জন্য কেউ তাড়াও দিচ্ছে না, তবু কর্মীরা প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের মনের কথা বুঝতে পারল: 'তাড়াতাড়ি! আরো জলদি কাজ কর! আরো জলদি!'

তার সেই টেলিফোন আলাপের পর আন্না ব্রিজ তৈরীর দলে যোগ দিয়েছে। পাসোকিতে এখন আর সে ফিরে যায় না। বুড়ী পেত্রিশ্চেভাকে বলে এসেছে তার গোরুটোর দেখাশুনো করতে। বাবার জ্যাকবুট জোড়া পরে আন্না জল

ভেঙে জমা কাঠের ওখানে গিয়ে কাঠ তুলে নিয়ে আসে শুকনো জমিতে। প্রথম কয়দিন সে সবকিছু ভুলে গিয়ে এমন গভীর আবেগে কাজ করল যে তার সেই কাজের উৎসাহ আর আনন্দ দেখে সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল মেয়েটা এই আনন্দ, এই সংক্রামক তৎপরতা পেল কোথা থেকে?

কিন্তু প্রথম কয়দিনের উত্তেজনা কেটে যাবার পর আন্নার উৎসাহ যেন নিভে এল। সে দেখল এই নতুন জীবন তার পুরনো জীবনের উপর জোরে চড়াও হয়েছে। সে ভয় পেরে গেল। কালিনার এত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে যৌথখামারে যোগ দেয়নি, আন্না ঠিক করল এবারও সে তেমনিভাবে নতুন জীবনকে মেনে নেবে না। বাবা যে তাকে বারণ করে দিয়ে গেছে। বাবার সেই ধমক আন্নার মনে পড়ল: 'খবরদার আন্না!' সে আরো চঞ্চল হয়ে উঠল। বাড়ির সেই অভ্যস্ত পরিচিত পরিবেশে ফিরে যাবার প্রবল আকর্ষণ অনুভব করল। ইচ্ছে হল এখনি কাজ ছেড়ে দিয়ে, দল ছেড়ে গ্রামে ফিরে যায়, কিন্তু দেখল সে ক্ষমতা তার আর নেই। তখন সে নিজেকে বোঝাতে চাইল, সে যা করছে তা সবই ইভানের জন্য। মন তার তখনকার মতো প্রবোধ মানল।

প্রচারকর্মীদের দল একদিন ব্রিজ তৈরীর কাজে এসে এক গাছ থেকে আরেক গাছ পর্যন্ত লাল কাপড় বেঁধে দিল। তাতে লেখা: 'একদিন মানে পাঁচশ কিউবিক মিটার কাঠের গুঁড়ি।'

'নোটিশটা জ্বালালে...' বলল বুড়ো পেতেলিৎসা, 'সারাক্ষণ এখন কথাটা মাথায় ঘুরছে... একমুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয় না।'

'পাঁচশ কি এক হাজার — আমার কাছে সবই সমান,' আন্না জবাব দিল, 'আমি বাবা, এখন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি। ঘরদোর তো দেখতে হবে।'

আন্নার নিরুৎসাহে খিটখিটে বুড়ো রেগে গেল। আন্না কিন্তু মনে মনে নিজেকে আশ্বস্ত করতে লাগল একগুঁয়ের মতো: ঠিকই তো, সে তো কেবল ইভানের জন্যই কাজ করছে। অন্য আর কিছুতে তার উৎসাহ নেই।

বহু রাত পর্যন্তও কুড়ুলের শব্দের বিরতি নেই। আগুন জ্বালিয়ে কাজ চলেছে। একদল থামের উপর আরো কাঠের গুঁড়ি বসাচ্ছে, আরেকদল ব্রিজপথের তক্তা আর রেলিং তৈরী করছে, যাতে ভিৎটা তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিজ পত্তন সুরু হতে পারে।

শেষকালে একদিন কাঠুরেদের ছাউনিতে খবর পৌঁছল — রবিবার দিন ব্রিজ শেষ হয়ে যাবে। ঐ দিনই লরী আর ঘোড়াগাড়ি চলতে সুরু করবে।

রুসিঙ্কো খবরটা পেল দূরের একটা ছাউনিতে, কাঠুরেদের চার নম্বর দলটা সেখানে কাজ করছে। সম্পাদক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল, অন্ধকারের আগেই যাতে ব্রিজে পৌঁছন যায়। ইভান শেকেতা তাকে পথ দেখানর জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে

এল। পাহাড়ের খাড়া দুর্গম পথ বেয়ে তারা খাদে নামতে লাগল।

ইভান আগে আগে তার কাজ করা ছড়িটা দিয়ে পাথরগুলো ঠুকতে ঠুকতে এগোতে থাকল, রুসিঙ্কো তার পিছনে। ইভানের কানে পৌঁছতে লাগল এই অক্লান্ত মানুষটির হাঁপানো।

পথ চলার প্রথমদিকটায় ইভান চুপ করেই ছিল, রুসিঙ্কোর সঙ্গে কথা বলার সাহস তার হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর চুপ করে থাকতে পারল না:

'আমার কি মনে হয় জানেন কমরেড সম্পাদক, আজ যে বিদ্যুৎ চালিত করাতের কথা বললেন ওরকম করাত আমাদের হয় না?'

'আমরাও পাব,' রুসিঙ্কো বলল।

'তা তো নিশ্চয়ই,' ইভান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু এখন যদি থাকত! আপনি ছাউনিতে চলে যাবার পর আমরা সবাই হিসেব করে দেখলাম বিদ্যুৎকরাতে কত গাছ কাটা যায়।'

'কী দেখলে? অনেক?' রুসিঙ্কো বলল।

'অনেক মানে! সংখ্যা দেখে পুরনো কাঠুরেরা তো ঘাবড়েই গেল।'

'কেন ঘাবড়ে গেল?'

ইভান হেসে বলল, 'ওরা বলাবলি করতে লাগল অত গাছ কাটলে আমরা তো বেকার হয়ে পড়ব।'

'তোমার কী মনে হল?'

'আমার ধারণা ...' ইভান একটু বিব্রত, 'আমার ধারণা অত গাছ কাটতে পারলে কমিউনিজম আমাদের হাতের কাছে এসে যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' মহানন্দে রুসিঙ্কো এমন কি এক সেকেন্ড দাঁড়িয়েও পড়ল ভালো করে শেকেতার মুখটা দেখে নিতে।

রুসিঙ্কো আর ইভান যতই এড়াবার চেষ্টা করুক না কেন পাহাড়ে অঞ্চলের হঠাৎ এসে পড়া রাত্তির তাদের ঠিক মাঝপথেই ধরে ফেলল। রুসিঙ্কো আর ইভান বাঁয়ে বেঁকে কাঠুরেদের পয়লা দলের ছাউনিতে এসে উপস্থিত হল। ইভানের পরামর্শ মতো ঠিক করল রাতটা এখানেই কাটিয়ে সকালবেলা আবার রওনা হবে।

ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গেই কাঠুরেরা উঠে পড়ল। বেশ পরিষ্কার সকাল। বীচগাছের শূন্যপাতা চূড়ার ফাঁক দিয়ে মেঘমুক্ত আকাশ দেখা যাচ্ছে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে, অনেক উঁচুতে সযত্নে গাদা করা কাঠ আর নতুন গুঁড়ির সাদা গা চমকে উঠছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেজা চাঁচনির মিষ্টি গন্ধ। বনের মাটি রুপোলি বরফ শিশিরে ঝক্‌মক্‌ করছে।

পাহাড়ে ঝরণায় মুখ ধুয়ে নিয়ে রুসিঙ্কো আর ইভান বেরিয়ে পড়ল। কাঠুরেদের পয়লা দলের সবাই তাদের সঙ্গ নিল। চারদিক থেকে কাঠুরেরা পাহাড় বেয়ে নেমে এল, নদীর ধারার মতো।

রুসিঙেকা কোনরকমে তাদের অভিবাদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে চলল। শুধু বুড়ো আর প্রৌঢ়রাই নয়, তাদের ল্যাজধরা বাচ্চা ছেলেগুলো পর্যন্ত মনে করল রুসিঙেকার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করাটা তাদের কর্তব্য।

রুসিঙেকা শুনল আলো ফোটার আগেই লরীগুলো ব্রিজ পার হয়েছে, এখন যে কোন মুহূর্তে তারা কাঠবোঝাই হয়ে ফিরবে।

'বড় বেশি ঘুমিয়েছি!' রুসিঙেকা ইভানের দিকে চোখ ঠেরে বলল।

'কী করে জানব বলুন?' ইভান লজ্জায় পড়ে গেছে, 'ওদের সঙ্গে তাল রাখা অসম্ভব।'

রুসিঙেকা মাল ওঠাবার জায়গার দিকে পা বাড়াল। এমন সময় হঠাৎ গুম্ গুম্ আওয়াজ শোনা গেল। দেখা গেল ব্রিজের দিক থেকে কতগুলো লরী আসছে।

কাঠবোঝাই গাড়িগুলো আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। গুরু গুরু শব্দ উঠেছে তাদের ট্রেলারগুলোর। চাকার তলে পথের পাথর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

পেরিয়ে যাওয়া লরীগুলোর দিকে কাঠুরেরা হাঁ করে চেয়ে রইল, যেন এ অঞ্চলে আগে কখনো তারা লরী দেখেনি।

'পঁচিশ দিন কমরেড সম্পাদক,' শেকেতা বলল।

'হ্যাঁ, পঁচিশ দিন,' রুসিঙেকা মাথা নেড়ে মনে মনে এই পঁচিশটা দিন দেখতে চেষ্টা করল।

লরীগুলো একটা মোড়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনের নীল ধোঁয়ার রেখাটা মিলিয়ে যাবার আগেই কাঠুরেদের একজন চেঁচিয়ে উঠল:

'ঐ যে ওরা আসছে!'

ব্রিজ নির্মাতারা তাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় দল বেঁধে এই দিকেই আসছে। কাঁধে তাদের কুড়ুল করাত কোদাল। রুসিঙ্কো আর কাঠুরেদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য তারা একটু দাঁড়িয়ে গেল। বসন্তের নির্মল বাতাসে তাদের কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা আর আনন্দের সুর বেজে উঠল।

আন্না বুড়ো পেতেলিংসার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। বুড়োর তিন ছেলে তার দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ভোরের হিমে লালগাল আন্না ইভানের আশায় চোখ কুঁচকে চারদিকে চেয়ে দেখছে। ওই তো ইভান! রুসিঙ্কোর পাশে দাঁড়িয়ে একটা শেওলা পড়া পাথরের গায়ে তার কাজ-করা ছড়িটা ঠুকছে। আন্না চোখ নামিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। এমন সময় রুসিঙ্কো ডাকল।

'এই যে য়াৎসিনা! আমায় চেন না নাকি, পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছ যে?'

আন্না অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সুপ্রভাত, কমরেড সম্পাদক।'

'সুপ্রভাত,' রুসিঙ্কো সোল্লাসে উত্তর দিয়ে নিজের বিরাট হাত দিয়ে আন্নার হাতটা নেড়ে দিল, 'তোমায় ধন্যবাদ!'

'কেন?' আন্না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তোমার কাজের জন্য, লোকের ভাল কিসে হয় সেকথা ভাবার জন্য।'

রুসিঙ্কোর কথাগুলো সবার কানেই পেঁাছল। নেমেশ আর ইভানের কানেও, আন্না তার দিকে সাহস করে তাকাতে পারছে না।

'তার কোন দরকার নেই, কমরেড সম্পাদক,' আন্না মৃদুস্বরে বলল, 'আমি আর কীই বা করেছি...'

'তুমি অনেক করেছ,' রুসিঙ্কো নরম করে বলল, 'আরো অনেক করবে। এতো সবে আরম্ভ, কেবল আরম্ভ!..'

আন্নার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখদুটো অন্তরের আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের প্রতিও পূর্ণ বিশ্বাস তার মনে জেগে উঠেছে।

রুসিঙ্কোর চোখে ধরা পড়ল সেই আলো। এই আলো আর নিভে যাবে না। আন্নার চেহারা তা বদলে দিয়েছে। তার মুখের সেই ভীরু, মাথা নোয়ান ভাবটা কোথায় দূর হয়ে গেছে। শক্ত করে চাপা ঠোঁটদুটো খুলে গিয়ে দেখা দিয়েছে এক মিষ্টি শান্ত হাসি। দাবাগ্নির মতো দ্রুত জ্বলে উঠে সে আলো আন্নার হঠাৎ সুন্দর হয়ে উঠা মুখের সবকিছুকে আলোকিত করে তুলেছে।

হয়ত রুসিঙ্কো ছাড়া আরো কারো চোখেও সে সৌন্দর্য ধরা পড়েছিল। হয়ত...
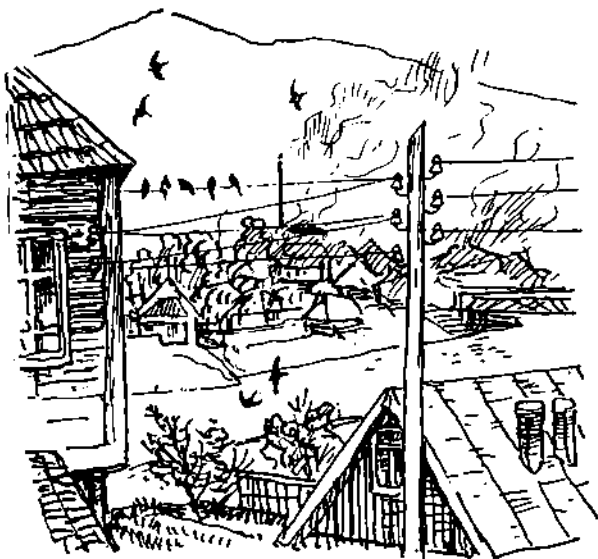
## পরিশেষ হিসেবে

অক্টোবরের এক সুন্দর দিনে ভোরবেলা আমি স্লেগোভেৎস ছেড়ে চলেছি। দিনের এই প্রথম ঘণ্টায় পাহাড়ের উপরে জাঁকিয়ে বসেছে হেমন্তের ঠুনকো কুয়াশার পর্দা। মনে হচ্ছে হঠাৎ নড়লে বা চেঁচিয়ে উঠলে চারপাশের সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে, জেগে উঠবে এক শুভ্র রুপোলি শব্দের বিচিত্র তরঙ্গ।

কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমায় উজগরদ নিয়ে যাবার জন্য নিচে, হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আলোটা না জ্বালিয়েই ভোরের আধো আলো আধো অন্ধকারে আমার পান্ডুলিপি বাক্সে ভরে নিলাম। পাতাগুলোর ক্ষীণ খস্‌খস্‌ আওয়াজ কানে পৌঁছল, মনে হল ওরা যেন নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে।

আবার মনে পড়ল তাদের কথা, যাদের সঙ্গে গিরিদ্বারের কাছের জেলার এই ছোটো হোটেলটায় এ কয়দিন একসঙ্গে থেকেছি। তাদের গলার স্বর এখনো কানে বাজছে। আমার কাছে তারা তাদের ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করেছে, তার ফলে হঠাৎ পরিচয় পেয়েছি সরল মানুষের হৃদয়ের শান্ত সৌন্দর্যের। সেই সৌন্দর্য আমাদের আনন্দ দেয়, বিরাট প্রান্তরে একটুখানি আলোর হাতছানির মতো সে আমাদের খুসী করে তোলে, বুঝতে পারি এই সৌন্দর্যই হল জীবন, আমাদের সকলের জীবন!

স্নেগোভেৎস এখনো ঘুমিয়ে। হোটেলের অতিথিরাও ঘুমে মগ্ন। এরা অধিকাংশই নতুন, আমার অপরিচিত। এদের মধ্যে চারজন হচ্ছে লরী ড্রাইভার। মলদাভীয়া থেকে পাহাড় পার হয়ে এতটা পথ এসেছে বিখ্যাত কার্পেথিয়ান বীচকাঠের জন্য। আর আছেন এক অবসরপ্রাপ্ত লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল। এখন তিনি উজগরদে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বক্তা। এছাড়াও ঘুমচ্ছে টেলিফোন মেকানিকরা, দূরের গ্রামগুলিতে টেলিফোন

বসানর কাজে তারা এসেছে। একেবারে শেষ বিছানাটায় কম্বলে মাথা মুড়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে ইভান শেকেতা, পাসেকির কাঠুরে সে। কয়েক বছর পর তার সঙ্গে দেখা হল। বুড়ো ভাসিল য়াৎসিনা আর তার মেয়ে আন্নাকে নিয়ে গল্প লেখার সময় তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। ইভান কিন্তু আগের মতোই আছে — ছিপছিপে প্যাংলা সুদর্শন উদ্ধত। গতকাল রাত্রে সে তার বউ আন্না য়াৎসিনাকে স্লেগোভেৎসের হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম আসন্ন।

ঘুমন্ত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছি, 'নতুন দিন সুরু হবার পর মনের কোণে লুকনো কোন চিন্তা এরা পরস্পরের কাছে প্রকাশ করবে কে জানে, কোন নতুন "অলৌকিকের" বার্তা বয়ে আনবে সেই দিন? কী বলবে এরা? এদের হৃদয়ের কোন অনুভূতি আমার আর জানা হয়ে উঠবে না?'

হোটেল ছেড়ে যাব বলে মন খারাপ হয়ে গেল। যদিও ভাল করেই জানি জীবন সর্বত্রই রয়েছে, সবখানেই রয়েছে জনগণ। জানি, বই হল জীবনেরই মতো, কোথাও শেষ দাঁড়ি টানা যায় না...

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবভস্কি বুলেভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

МАТВЕЙ ТЕВЕЛЕВ

# ГОСТИНИЦА В СНЕГОВЦЕ

рассказы

মাৎভেই তেভেলেভ
স্নেগোভেৎসের হোটেলে